POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ۠

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।’

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

সংখ্যা 42

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 16 Oct, 2025 23 রবিউস সানি-1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে বিতর্ক করবেন।

২২২৭) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেন- "তিন ব্যক্তি আছেন, যাদের বিরুদ্ধে আমি কিয়ামতের দিনে নিজেই মোকাবিলা করব: প্রথমত, সে ব্যক্তি যে আমার নামে কোন অঙ্গীকার করে, কিন্তু পরে তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করে; দ্বিতীয়ত, সে ব্যক্তি যে কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে এব তার বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ ভোগ করে; তৃতীয়, সে ব্যক্তি যে কোন শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করে, তার কাছ থেকে পূর্ণ কাজ গ্রহণ করে, কিন্তু তার প্রাপ্য মজুরি প্রদান করে না।

কোন প্রতিবেশী অধিক হকদার?

২২৫৯) হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন: আমি নিবেদন করলাম, "হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছেন- তাদের মধ্যে আমি কার প্রতি উপহার প্রেরণ করব?

রসুলুল্লাহ্ (সা.) উত্তর দিলেন,

"তাদের মধ্যে সেই প্রতিবেশীর প্রতি উপহার প্রেরণ করো, যার দরজা তোমার দরজার নিকটবর্তী।"

যারা পদপ্রাপ্তির আকাঙ্খা করে

২২৬১) হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী বর্ণনা করেছেন: আমি ইয়েমেন থেকে হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে হাজির হলাম, আমার সঙ্গে আশ'আর গোত্রের দুইজন ব্যক্তি ছিলেন। তারা নবী করীম (সা.)-এর কাছে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের অনুরোধ করলেন। আমি নিবেদন করলাম, "আমি জানতাম না যে তারা এমন দায়িত্বের আকাঙ্খা করে।"

রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "আমরা তাদেরকে দায়িত্বে নিয়োগ করি না, যারা নিজে তা কামনা করে।" বর্ণনাকারী বলেন: নবী করীম (সা.) উচ্চারণ করেছিলেন: لَنْ نَّسْتَعْمِلَ অথবা لَا نَسْتَعْمِلُ।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৮)

আমাদের কর্তব্য হল, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন না করা। অন্যথায় তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা এক গুরুতর পাপ হিসেবে গণ্য করা হবে

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

প্রতিশ্রুত মসীহর কারণে নামায একত্রিত করার ভবিষ্যদ্বাণী

যেমনভাবে আল্লাহ্‌র ফরজ বিধানসমূহ পালন করা আবশ্যক, তেমনি তাঁর প্রদত্ত ছাড় বা অবকাশ সমূহের উপরও আমল করা উচিত। ফরজও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর অবকাশও আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

দেখো, আমরাও এই অবকাশগুলির আমল করছি। এখন দুই মাসেরও বেশি সময় হলো যে আমরা নামাযসমূহ একত্রিত করে আদায় করছি। এর কারণ হল অসুস্থতা এবং আল ফাতিহার তফসীর লেখায় গভীর ব্যস্ততা। এই নামাযসমূহ একত্রিত করার মধ্যে تُجْمَعُ لَهُ الصَّلٰوةُ অর্থাৎ, 'তার খাতিরে নামাযসমূহ একত্রিত করা হবে'- এই হাদীসেরই পরিপূর্ণতা ঘটেছে।

এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে প্রতিশ্রুত মসীহ নিজে ইমামতি করবেন না; বরং অন্য একজন ইমাম হবেন, যিনি মসীহের খাতিরে নামাযসমূহ একত্রিত করে আদায় করাবেন। প্রকৃতপক্ষে এখন তাই হচ্ছে- যেদিনগুলিতে আমি প্রবল অসুস্থতার কারণে একেবারেই আসতে পারি না, সেদিন নামাযসমূহ একত্রিত করা হয় না। উপরন্ত, এই হাদীসের শব্দচয়ন থেকেই বোঝা যায় যে হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) ভালবাসার ভঙ্গিতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ব্যক্ত করেছিলেন যে, তাঁর (মসীহের) খাতিরে এমনটি ঘটবে।

আমাদের কর্তব্য হল, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন না করা। অন্যথায় তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা এক গুরুতর পাপ হিসেবে গণ্য করা হবে।

আল্লাহ্ তা'লা নিজেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যে, দীর্ঘ সময় ধরে নামাযসমূহ একত্রিত করে আদায় করা হচ্ছে। যদি এটি এক-দুদিনের জন্যই হতো, তবে এটিকে কোন নিদর্শন বলা যেত না। আমরা হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ ও অক্ষরকে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করি।"

(মালফুযাত, খণ্ড-২, পৃ: ৯২-৯৩, সংস্করণ ২০১৮, কাদিয়ান)

"বিশ্বে সবচেয়ে বড় অবিচার হল এই যে , যিনি মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক শান্তি এনে দিয়েছিলেন, সেই নবীকেই যুদ্ধবাজ বলা হয়, এবং খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা মোমেনের প্রারম্ভিক আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

অনেক মানুষ আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন, যারা বলেছেন যে তারা কুড়ি বা ত্রিশ বছর ধরে মদ্যপান থেকে বিরত রয়েছেন, কারণ তারা স্বভাবগতভাবে এক অকল্যাণকর বস্তু মনে করেন। একইভাবে, যে ধারণাটিকে এক সময় 'পর্দা' বা হিজাব বলে সমালোচনা করা হত, আজ ইউরোপেও এমন মানষ দেখা যাচ্ছে যারা এর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করছে। আসলে, ইউরোপ সফরের সময় একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। সেই একই সঙ্গীতশিল্পী, যার কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, তিনি আমাকে বললেন,"আমি আপনার তফসীরুল কুরআন-এর ভূমিকাটি পড়েছি, এবং এটি আমার মনে একটি সংশয় জাগিয়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি সংশয় সৃষ্টি হয়েছে?" তিনি বললেন, "সে বইটিতে আপনি লিখেছেন যে একবার মহানবী (সা.) মসজিদে ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর এক মহিয়সী স্ত্রী তাঁকে দেখতে এলেন। ফেরার সময় রাত হয়ে গিয়েছিল, তাই নবী করীম (সা.) তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন। পথে এক ব্যক্তি তাঁদের সামনে এল, আর নবী করীম (সা.) আশঙ্কা করলেন যে হয়তো লোকটি আমার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়বে- ভাববে, তিনি কোন অপরিচিত নারীর সঙ্গে চলেছেন। তখন নবী করীম (সা.) তাঁর স্ত্রীর মুখ থেকে পর্দা উঠিয়ে দিলেন এবং লোকটিকে বললেন, 'দেখো, এটি আমার স্ত্রী।'

সঙ্গীতশিল্পী বললেন, "এই ঘটনাটি পড়ে আমার মনে আপত্তি জাগল। ইসলাম ধর্মে 'পর্দা' পালন একটি অত্যন্ত উচ্চতর বিধান, যা পবিত্রতার প্রাণ। যদি এমন কোনো দুর্ভাগা ব্যক্তি, যিনি নবী করীম (সা.)-এর পাঞ্চাশ বা ষাট বছরের নিষ্কলুষ জীবন প্রত্যক্ষ করেও তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে সংশয় পোষণ করেন, তবে নিঃসন্দেহে সে জাহান্নামী। এমন একজন লোকের কী গুরুত্ব, যার বিশ্বাস রক্ষার জন্য নবী করীম (সা.)-কে তাঁর এক স্ত্রীর পর্দা তুলতে হলো। যিনি নবী করীম (সা.)-এর ত্যাগ, ইসলাম, ঈমান ও আল্লাহ্ প্রেম দেখেও সংশয়ে পড়েন, তাঁর মৃত্যুতেও কোনও ক্ষতি ছিল না। তাহলে কেন নবী করীম (সা.) তাঁর স্ত্রীর মুখ থেকে পর্দা তুললেন, কেবলমাত্র এমন এক ব্যক্তির ঈমান রক্ষার জন্য?"

আমি তাঁকে বললাম, "অর্থাৎ আপনার আপত্তি এই যে, মহানবী (সা.) একটি ছোট বিষয়ের জন্য একটি বড় বিষয় ত্যাগ করলেন? নিশ্চয়ই, ঐ ব্যক্তির ঈমান মূল্যবান ছিল, কিন্তু তা ছিল এক

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়......)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) তাকে এই অভিযানের দলনেতা নিযুক্ত করে নির্দেশ দেন, সালামের অধিক প্রচলন করবে, অর্থাৎ শান্তির প্রসার ঘটাবে, মানুষকে খাবার খাওয়াবে; এমন নয় যে, তাদেরকে ক্ষুধার্ত মারবে; আল্লাহ্ তা'লাকে এমনভাবে লজ্জা করবে যেভাবে একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের লজ্জা পেয়ে থাকে; যখনই কোনো ভুল অথবা পাপ হয়ে যাবে– এর অনতিবিলম্বে পুণ্য করবে, কেননা পুণ্য পাপ মোচন করে দেয়।

হুনাইনের যুদ্ধেও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এমন সৈন্যবাহিনী অবতরণ করার উল্লেখ পাওয়া যায় যাদেরকে ফেরেশতা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: "খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো, যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তাকে কেউ মারতে পারে না। সত্যিকার অর্থে মৃত্যুকে বরণকারী (দল) নবীদের জামা'তই হয়ে থাকে। অতঃপর কে আছে যে তাকে মারতে পারে? কখনো নয়। মানুষ চেষ্টা করে যেন আল্লাহ্ তা'লার পথে মৃত্যু লাভ হয়, কিন্তু ফেরেশতারা চেষ্টা করে যেন তাকে জীবিত রাখা যায়।

ডক্টর সৈয়্যদ শিহাব আহমদ সাহেব (কানাডা) এবং মাননীয় মুবারক খোখর সাহেব (লাহোর)–এর স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (১২ তবুক, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আমি হুনাইনের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করছিলাম। এর পরবর্তী বিবরণ এরূপ:হুনাইনের যুদ্ধেও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এমন সৈন্যবাহিনী অবতরণ করার উল্লেখ পাওয়া যায় যাদেরকে ফেরেশতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। হুনাইনের যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلٰى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ (التوبۃ:26)

অর্থ: অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও মু'মিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং এমন সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাদের তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না, আর তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন যারা কুফরি করেছিল এবং কাফিরদের প্রতিদান এমনই হয়ে থাকে।

তফসীরকারক ও জীবনীকারগণ এই যুদ্ধে ফেরেশতাদের অবতরণ নিয়ে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। কতকের ধারণা হলো, ফেরেশতাদের অবতরণ শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ ও তাদের হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য ছিল, নতুবা ফেরেশতারা বাস্তবিক অর্থে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি। এই ধারণাও কিছু সহীহ হাদীসের বিপরীত। সহীহ রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণ হয়, ফেরেশতারা যুদ্ধে বাস্তবিক অর্থে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে এখানে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, সাহায্যের জন্য তো একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট ছিল; তাহলে হাজার হাজার ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ হলো? ইমাম ইবনে কাসীর সহীহাইনে (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমে) বিদ্যমান যুদ্ধের সময় ফেরেশতাদের অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর উল্লেখ করার পর লেখেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের অবতরণ এবং মুসলমানদের এ বিষয়ে অবগত করানো সুসংবাদস্বরূপ ছিল, নতুবা আল্লাহ্ তা'লা এটি ছাড়াও তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করতে পারেন। তাই তো তিনি বলেছেন, সাহায্য কেবল আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই। আর সূরা মুহাম্মদে বলেছেন, আল্লাহ্ চাইলে নিজেই সেই কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারেন, কিন্তু তিনি পরীক্ষা গ্রহণ করেন।" (আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল , ২৪–১৯, জুলাই, ২০২৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–ও এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, কুরআনে ফেরেশতাদের সাহায্যের সুসংবাদের ঘটনা রয়েছে যেন মু'মিনদের হৃদয় আশ্বস্ত হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের কোনো ভয় না থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মু'মিনদের সাথে ওয়াদা করেছেন এবং তাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন, তিনি পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়ে তাদের সাহায্য করবেন। এই সংখ্যা বর্ধিত করে দেখানোর কারণ হলো তাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া, যদিও ফেরেশতাদের মধ্যে একজন ফেরেশতাই এই ক্ষমতা রাখে যে, সে নিজ প্রভুর আদেশে পৃথিবীকে ওলটপালট করে দিতে পারে। এর জন্য পাঁচ হাজার কেন, পাঁচজনেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে মহান সাহায্য দেখাতে চেয়েছেন, তাই তিনি এমন শব্দ বেছে নিয়েছেন যা দ্বারা সাহায্যকারীদের সংখ্যাধিক্য প্রকাশ পায় এবং এটাই ছিল বলার উদ্দেশ্য। (আততাবলীগ, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)–ও তফসীরে সগীরে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা দিয়েছেন। সূরা আলে ইমরানের ১২৭ নম্বর আয়াতের টীকায় তিনি লেখেন, ফেরেশতাদের উল্লেখ শুধু এজন্য করা হয়েছে কারণ স্বপ্ন বা কাশফে এই সুসংবাদ লাভের ফলে মানুষের সাহস বৃদ্ধি পায়; নতুবা মূল উদ্দেশ্য এটাই (জানানো) ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করবেন।" (তফসীরে সাগীর, পৃ: ৯৬, সূরা আলে ইমরান, ১২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়) অর্থাৎ এটিও একটি কাশফি রূপ প্রকাশ পেয়েছিল।

অতঃপর এক স্থানে তিনি বলেন, "খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো, যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তাকে কেউ মারতে পারে না। সত্যিকার অর্থে মৃত্যুকে বরণকারী (দল) নবীদের জামা'তই হয়ে থাকে। অতঃপর কে আছে যে তাকে মারতে পারে? কখনো নয়। স্থায়ী জীবন লাভের মূলমন্ত্র এটিই যে, মানুষ যেন আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আর যখন কোনো মানুষ এই সংকল্প নিয়ে দণ্ডায়মান হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লার ফেরেশতারা তাকে জীবিত রাখার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। যেন এক কুস্তি শুরু হয়ে যায়। মানুষ চেষ্টা করে যেন আল্লাহ্ তা'লার পথে মৃত্যু লাভ হয়, কিন্তু ফেরেশতারা চেষ্টা করে যেন তাকে জীবিত রাখা যায়।

যখন আল্লাহ্র বান্দা বলে, আমি আল্লাহ্র জন্য মরতে চাই– তখন আল্লাহ্ তা'লার সব ফেরেশতা বলে, আমরা মরতে দেবো না! আর অবশেষে ফেরেশতারাই জয় লাভ করে। বান্দা চায় যেন মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারে, আর এর জন্য সে নিজেকে এমন পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেয় যার পরিণাম মৃত্যু হয়ে থাকে, কিন্তু সে মরে না। হুনাইনের ঘটনাই দেখো, শত্রুরা যখন আক্রমণ করতে করতে এগিয়ে আসে তখন মহানবী (সা.)–এর কাছে কেবল বারোজন ছিল, বাকি সবাই শত্রুদের তির নিক্ষেপের ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় হযরত আব্বাস বলেন, হুযূর! কিছুটা পেছনে সরে আসুন। কিন্তু তিনি (সা.) বাহনকে সামনে হাঁকান এবং এগিয়ে যেতে যেতে বলেন, اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্ তা'লার সত্য নবী, আমি কী করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে পারি? এটি এমন এক বাক্য ছিল যা (নিজের) মানব সত্তাকে ভুলিয়ে দিয়ে (মানুষকে) আল্লাহ্ তা'লার সামনে উপস্থিত করে। চার হাজার তিরন্দাজের বিপরীতে একজন ব্যক্তি বলছে, আমি এখান থেকে সরতে পারি না!সুতরাং (তখন) মানুষ নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লাই কথা বলছিলেন। মহানবী (সা.) সেই সময় এটি বলেছিলেনও যে, اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ অর্থাৎ, আমি তো কেবল মানুষই। সুতরাং যখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্র পথে মরতে চাই, তখন আল্লাহ্ তা'লার ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয় এবং হুনাইনের (সাময়িক) পরাজয় বিজয়ে রূপান্তরিত হয় আর তিনি (সা.) বিজয়ী হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেন।" (খুতবাতে শুরা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬১২–৬১৩)

শত্রুদের পরাজয় ও পলায়ন সম্পর্কে পূর্বে এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) যখন আনসারকে ডাকেন এবং তারা ফিরে আসেন আর এরপর একান্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন, তখন একইসাথে মহানবী (সা.) দোয়াও করেন এবং নিজ হাতে কাফিরদের দিকে মুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। যার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, বনুহাওয়াযিন, যারা দাবি করেছিল– আজ পর্যন্ত কোনো যোদ্ধা জাতির

সাথে মুহাম্মদ (সা.)-এর মোকাবিলা হয় নি; আমাদের সাথে মোকাবিলা হলে আমরা দেখিয়ে দেবো- যুদ্ধ কাকে বলে;আর যারা প্রকৃত অর্থেই আরবের শক্তিশালী গোত্রগুলোর একটি ছিল; অর্থাৎ এটা শুধু কথার কথা নয়, বরং সত্যিই তারা শক্তিশালী গোত্র ছিল- তারা অল্পক্ষণের মধ্যেই পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করে। নিজেদের স্ত্রী-সন্তান ও ধনসম্পদেরও কোনো খোঁজ কেউ রাখে নি। মুসলমানদের হাতে বহু মানুষ নিহত হয় এবং হাজার হাজার লোক বন্দি হয় আর পলায়নকারীদের বিরাট সংখ্যা আওতাসের দিকে পালিয়ে যায়।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৮৫)

এই যুদ্ধে হাওয়াযিনের শত শত লোক নিহত হয়। হযরত আবু তালহা বিশজন মুশরিককে হত্যা করেন। অনুরূপভাবে আওতাসের অভিযানে মুশরিকদের তিনশ লোক নিহত হয়। হাওয়াযিনের পলায়ন সত্ত্বেও সাকীফের যোদ্ধারা অটল থাকে। অর্থাৎ সাকীফ গোত্র অটল থাকে এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে থাকে, এমনকি তাদের সত্তরজন নিহত হয়। তাদের সর্বশেষ পতাকাবাহী ছিল উসমান বিন আব্দুল্লাহ্। যখন সে নিহত হয় তখন সাকীফও পালিয়ে যায়। উসমানের নিহত হওয়ার সংবাদ যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি ইসলামের এই শত্রু সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তাকে নিজ রহমত থেকে দূরে রাখুন। সে কুরাইশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। অপরদিকে তার হত্যাকারী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবী উমাইয়্যার জন্য রহমত প্রাপ্তির দোয়া করেন এবং হযরত আব্দু ল্লাহ্ বলেন, আমি আশা রাখি- আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই অবস্থাতেই শাহাদত দান করবেন। অতএব তিনি তায়েফের অবরোধ চলাকালেই শাহাদত লাভ করেন। কতক বর্ণনা অনুযায়ী সর্বশেষ পতাকাবাহী উসমান বিন আব্দু ল্লাহ্কে হযরত আলী হত্যা করেছিলেন।

(মাগাযি, লিল ওয়াকিদি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯১১-৯১২) (তাবাকাত ইবনে সা'দ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫৫) (শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৩১) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ফি সীরাতি খাইরিল ইবাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৪)

কিন্তু পূর্বের রেওয়ায়েতটি অধিক বিস্তারিত।

এই যুদ্ধে চারজন সাহাবী শহীদ হন। তাদের নাম হলো: হযরত উম্মে আয়মানের পুত্র আয়মান বিন উবায়েদ। এই উম্মে আয়মান হলেন তিনি, যিনি মহানবী (সা.)-এর লালনকর্ত্রী ছিলেন; অর্থাৎ যত্ন ও প্রতিপালনকারিণী ছিলেন। সুরাকা বিন হারেস, তিনি আনসারী সাহাবী ছিলেন। তার পুত্র হারেসা বিন সুরাকা বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। ইয়াযীদ বিন যামআ, তিনি প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং অজ্ঞতার যুগেও কুরাইশের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কুরাইশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার কাছে পরামর্শ নিত। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার ভাগ্নে ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাওয়ার কারণে তার শাহাদত হয়েছিল। তিনি নীচে পড়ে যান এবং তারপর ঘোড়ার নীচে চাপা পড়েন। কারো কারো মতে তার শাহাদত তায়েফের যুদ্ধে হয়েছিল; এর উল্লেখও পরে আসবে। চতুর্থ জন ছিলেন হযরত আবু আমের, যার বিস্তারিত বিবরণও পরে আওতাসের অভিযানে আসবে।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৮৪] (উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৩)

হযরত আয়েয বর্ণনা করেন, হুনাইনের যুদ্ধে আমার কপালে একটি তির এসে লাগে এবং আমার মুখ ও বুকে রক্ত গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আল্লাহ্র রসুল (সা.) তাঁর পবিত্র হাত আমার মুখ ও বুক থেকে পেট পর্যন্ত বুলিয়ে দেন এবং স্বয়ং রক্ত পরিষ্কার করেন, যার ফলে রক্তপাত তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি আমার জন্য দোয়া করেন। কোনো কোনো বর্ণনাকারী এটাও বলেন যে, মহানবী (সা.) যে হাত বুলিয়েছিলেন, তাঁর পবিত্র হাতের সেই চিহ্ন পরবর্তীতেও তার শরীরে রয়ে গিয়েছিল।

(সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬২) (শারাহ যুরকানি, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৭)

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ, যিনি অশ্বারোহী দলের নেতা ছিলেন, তিনি প্রাথমিক পর্যায়েই গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হওয়ার সময় তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। একজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, যখন কাফিরদের পরাজয় হয় এবং মুসলমানরা নিজ নিজ তাঁবুর দিকে চলে যায়, তখন আমি আল্লাহ্র রসুল (সা.)-কে দেখলাম, তিনি লোকজনের মধ্যে হাঁটছেন এবং বলছেন, আমাকে খালিদ বিন ওয়ালীদের কাছে কে পৌঁছে দেবে? তিনি (সা.) যখন তার কাছে পৌঁছেন, তখন খালিদ হাওদার সাথে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। মহানবী (সা.) খালিদের কাছে বসে পড়েন এবং ক্ষত দেখে নিজের মুখের লালা লাগিয়ে দেন, যার ফলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। এছাড়া হযরত আব্দু ল্লাহ্ বিন আবী অওফা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলীও আহত হয়েছিলেন।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৭৯] (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬২)

মক্কা ও মদীনাবাসীদের কাছে হুনাইনের বিজয়ের সুসংবাদ পাঠানো হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে যখন হুনাইনের প্রান্তর থেকে কিছু মুসলমান পালিয়ে গিয়েছিল, তখন তাদের কতক মক্কায় চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে এই বার্তা প্রদান করে যে, মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে এবং মুহাম্মদ (সা.) নাউযুবিল্লাহ্ নিহত হয়েছেন। এই সংবাদে মক্কায় উপস্থিত মুনাফিকরা এবং যাদের হৃদয়ে বিদ্বেষ ছিল তারা অত্যন্ত খুশি হয় এবং বলতে থাকে, এখন আরবরা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে আসবে। এই সময়ে মক্কার আমীর আত্তাব বিন আসীদ পরম সাহসিকতা ও বীরত্বে র পরিচয় দেন এবং মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলেন: إِنْ قُتِلَ مُحَمَّدٌ فَإِنَّ دِيْنَ اللهِ قَائِمٌ، وَالَّذِيْ يَعْبُدُهُ مُحَمَّدٌ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ অর্থাৎ, যদি মুহাম্মদ (সা.) শহীদ হয়েও থাকেন তবুও নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র ধর্ম চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এবং যে সত্তার ইবাদত মুহাম্মদ (সা.) করতেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা- সেই সত্তা চিরন্তন, তিনি চিরঞ্জীব ও অমর এবং কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আর কিছুক্ষণ পরেই হুনাইন থেকে এই সুসংবাদও চলে আসে যে, মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছে এবং বনু হাওয়াযিন মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে। অনুরূপভাবে মদীনায়ও প্রথমে পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল, কেউ সেখানে এই সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিল। আল্লাহ্র রসুল (সা.) হযরত নাহীক বিন অওসকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি সূর্য ডুবতেই রওয়ানা হয়ে যাই। পথেও লোকেরা একথা বলছিল যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সৈন্যবাহিনী এমনভাবে পরাজয় বরণ করেছে যেমনটি পূর্বে কখনো হয় নি, আর মালিক বিন অওফের সৈন্যবাহিনী মুহাম্মদ (সা.)-এর বাহিনীর বিপরীতে বিজয় লাভ করেছে। তখন আমি বললাম, এসব মিথ্যা কথা; বরং আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নবীকে বিজয় দান করেছেন এবং তাদের মহিলা ও সন্তানদের বন্দিরূপে প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, আমি এই সংবাদ দিতে দিতে তিন দিনের মধ্যে মদীনায় পৌঁছে যাই আর আমি এর পূর্বে কখনো এত সফর করি নি। অর্থাৎ লাগাতার দ্রুত গতিতে সফর অব্যাহত রেখেছেন। অতঃপর মদীনায় পৌঁছে ঘোষণা দেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মুহাম্মদ (সা.) ভালো আছেন এবং মুসলমানরা বিরাট বিজয় লাভ করেন। আর আমি যখন সেখান থেকে অতিক্রম করছিলাম তখন মুসলমানরা কিছুটা গনিমতের সম্পদও একত্রিত করে ফেলেছিল এবং কিছু একত্রিত করছিল। এরপর তিনি [মহানবী (সা.)-এর] পবিত্র সহধর্মিণীদের কক্ষগুলোর দিকে যান এবং রসুলু ল্লাহ্ (সা.)-এর ভালো ও নিরাপদ থাকার সংবাদ তাদেরকেও প্রদান করেন। এতে তারা সবাই আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং আনন্দিত হন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫০৮) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৮০-২৮২] (যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০৮)

বনু হাওয়াযিনের সেনাপতি মালিক বিন অওফ- যে কিনা অনেক কষ্টে জীবন বাঁচিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছিল- সে এবং তার সঙ্গী একটি উপত্যকার ওপর দাঁড়িয়ে যায়। সে বলে, থামো! যেন দুর্বল লোকেরা এবং তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে। হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) তাদেরকে দেখে ফেলেন এবং তাদের ওপর আক্রমণ করে বসেন আর মালিক সেখান থেকে পালিয়ে সাকীফ-এর দুর্গে প্রবেশ করে। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৭১) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৩-৩৩৪)

মুহাল্লিম বিন জাসামা কর্তৃক এক ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং তার রক্তপণ আদায়ের ঘটনার বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে; মক্কা বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা করার অব্যবহিত পূর্বের খুতবায় ইযম-এর যুদ্ধাভিযানের বিবরণীতে এটি উল্লেখ করা হয়েছিল। আর তা হলো, একজন সাহাবী মুহাল্লিম বিন জাসামা (রা.) এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল যে চলার পথে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলেছিল, তা সত্ত্বেও তিনি (রা.) তাকে হত্যা করেছিলেন। এই ঘটনার বিশদ বর্ণনা কিছুটা এমন: হুনাইনের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) যখন তায়েফের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন একদিন যোহরের নামাযের পর তিনি (সা.) একটি গাছের নীচে আসন গ্রহণ করেছিলেন। উয়াইনা বিন হিসন উঠে দাঁড়ায় এবং হত্যাকৃত ব্যক্তি আমের বিন আযবাত আশজায়ীর হত্যার প্রতিশোধ দাবি করে। সাথে সাথে

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। **(সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)**

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

আকরা বিন হাবেস উঠে দাঁড়িয়ে মুহাল্লিম বিন জাসামাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তারা দুইজনই মহানবী (সা.)-এর সামনে তর্ক আরম্ভ করে দেয়। উয়াইনা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাকে অর্থাৎ হত্যাকারীকে ছাড়ব না। তাদের মহিলাদের ওপরও আমরা সেভাবে দুঃখ যাতনার পাহাড় চাপাবো যেভাবে সে আমাদের মহিলাদের ওপর দুঃখ-কষ্টের পাহাড় চাপিয়ে দিয়েছে। তিনি (সা.) তাকে বলেন, রক্তপণ নিয়ে নাও। ৫০টি উট এখনই নিয়ে নাও এবং ৫০টি উট মদীনায় পৌঁছেই নিয়ে নিও। কিন্তু উয়াইনা রক্তপণ নিতে অস্বীকৃতি জানায়। যাইহোক, কিছু কথাবার্তার পর পরিশেষে তারা রক্তপণ নিতে সম্মত হয়। হত্যাকারী মুহাল্লিম একদিকে দাঁড়িয়ে ছিল। সে কিসাসের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল যে, এখন তো আমার মৃত্যু অনিবার্য। রক্তপণ ইত্যাদির সিদ্ধান্ত হওয়ার পর মুহাল্লিম উঠে মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বসে যায়। তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। সে আবেদন করে, আপনি যে কথা শুনেছেন সেজন্য আমি আল্লাহ্‌ তা'লার নিকট তওবা করছি। আপনিও আমার ক্ষমার জন্য দোয়া করুন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কী? সে বলে, মুহাল্লিম বিন জাসামা। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি তার ইসলাম গ্রহণের শুরুতেই তাকে হত্যা করে ফেলেছ? অর্থাৎ সে এসেই বলেছিল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম'; তারপরও তুমি তাকে হত্যা করেছ? মহানবী (সা.) উচ্চৈঃস্বরে বলেন, হে আল্লাহ্‌! তুমি মুহাল্লিমকে ক্ষমা কোরো না। এই বাক্য সবাই শুনতে পেয়েছে। মুহাল্লিম পুনরায় নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি (আল্লাহ্‌র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনিও আমার জন্য ক্ষমা যাচনা করুন। তিনি (সা.) পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলেন যেন লোকেরা শুনতে পারে- হে আল্লাহ্‌! মুহাল্লিম বিন জাসামাকে তুমি ক্ষমা কোরো না। সে পুনরায় তৃতীয়বার বলে এবং মহানবী (সা.) তৃতীয়বারও একই কথা বলেন। অতঃপর মহানবী (সা.) তাকে বলেন, আমার সামনে থেকে উঠে চলে যাও। তখন সে তাঁর (সা.) সামনে থেকে ওঠে, আর সে নিজের চাদর দিয়ে চোখের পানি মুছছিল। ইবনে ইসহাকের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, তিনি বলেন, মুহাল্লিমের গোত্রের লোকেরা বর্ণনা করে, পরবর্তীতে মহানবী (সা.) তার (অর্থাৎ মুহাল্লিমের) ক্ষমার জন্যও দোয়া করেছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সীরাতি খাইরিল ইবাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৯-৩৪০) (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুদ দিয়াত, হাদীস-৪৫০৩) (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুদ দিয়াত, হাদীস-২৬২৫)

আওতাসের যুদ্ধাভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা হলো, হুনাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের পর বনু হাওয়াযিনের সৈন্যবাহিনী যে যেদিকে পেরেছে সেদিকে (জীবন বাঁচিয়ে) পালিয়েছে। তাদের একটি অংশ, যার মাঝে বনু হাওয়াযিনের সেনাপতি মালিক বিন অওফও ছিল- তারা তায়েফ অভিমুখে পলায়ন করে ও তায়েফের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর (সেনাবাহিনীর) এক অংশ আওতাস উপত্যকায় সমবেত হয় এবং অপরাংশ নাখলা তথানুখায়লার দিকে পলায়ন করে। আওতাস হলো হুনাইনের নিকটবর্তী একটি উপত্যকার নাম। যেহেতু বনু হাওয়াযিন তাদের স্ত্রী-সন্তান এবং সব সম্পদ ও গৃহপালিত পশু সাথে নিয়ে আক্রমণ করেছিল, আর তারা নিজেরা (দিগ্‌বিদিক) পালিয়ে যায়, তাই এখন এই সবকিছু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়ে যায়। ইসলামের ইতিহাসে তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের হস্তগত হওয়া এটি সব থেকে বেশি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ছিল।

মহানবী (সা.) সকল যুদ্ধবন্দি এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হযরত মাসউদ বিন আমর গিফারী (রা.)-র তত্ত্বাবধানে জিরানার দিকে প্রেরণ করেন এবং (তিনি) স্বয়ং পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে তায়েফ অভিমুখে যাত্রা করেন। আর হযরত আবু আমের আশআরী, যার (আসল) নাম ছিল উবায়েদ বিন সুলাইম, তার নেতৃত্বে একটি সেনাদল আওতাস (উপত্যকা) অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেই সেনাদলে হযরত আবু মুসা আশআরী ও হযরত সালমা বিন আকওয়া (রা.)-ও ছিলেন। হযরত আবু আমের (রা.) শত্রুদেরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন। শত্রুপক্ষের মাঝে দশজন ভাই ছিল যারা অতুলনীয় রণনৈপুণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সেই দশ ভাই সর্বপ্রথম দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য সামনে আসে। প্রথমে (তাদের) এক ভাই (দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য) আসে। হযরত আবু আমের শুরুতে তাকে ইসলামে দাওয়াত দেন, কিন্তু সে লড়াইকে প্রাধান্য দেয়। হযরত আবু আমের বলেন, اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌! তার বিরুদ্ধে সাক্ষী থেকো। একথা বলে তিনি তরবারি দিয়ে সজোরে এমন আঘাত করেন যে, সে দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অতঃপর দ্বিতীয় ভাই (লড়াইয়ের জন্য) আসে, হযরত আবু আমের (রা.) তাকেও ইসলামের দাওয়াত দেন আর তার অস্বীকৃতির কারণে লড়াই করেন এবং সে-ও মারা পড়ে। এভাবে এক এক করে নয় ভাই মারা যাওয়ার পর যখন দশম ভাই (লড়াইয়ের জন্য) আসে আর হযরত আবু আমের (রা.) পূর্বের মতো اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِ বলে তার ওপর আক্রমণ করার উপক্রম করেন, তখন সে বলে ওঠে, اَللّٰهُمَّ لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী থেকো না। (একথা বলার মাধ্যমে) সে এমন ভাব নেয় যেন সে ইসলাম গ্রহণ করছে। একথা শোনামাত্র হযরত আবু আমের (রা.) নিজের তরবারি নামিয়ে নেন এবং তাকে ছেড়ে দেন,কিন্তু সে ঘুরে এসে হযরত আবু আমের (রা.)-র ওপর আক্রমণ করে। সে [আবু আমের (রা.)-কে] ধোঁকা দেয়। কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে হযরত আবু আমের (রা.)-কে শহীদ করেছিল, কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী এটি সঠিক নয়; কেননা যে ব্যক্তি হযরত আবু আমের (রা.)-কে শহীদ করেছিল তাকে হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) সেই সময়ই হত্যা করেছিলেন। অধিক গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েত এটিই যে, দশম ভাই পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিল আর বলা হয়ে থাকে, তিনি খুবই ভালো মুসলমান সাব্যস্ত হন এবং পরবর্তীতে যখনই তার ওপর মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টি পড়ত তখন মহানবী (সা.) বলতেন, 'হাযা শারিদু আবি আমির' অর্থাৎ, এ আবু আমেরের তরবারি থেকে রক্ষা পাওয়া ব্যক্তি। মোটকথা, হযরত আবু আমের (রা.) এভাবেই সাহসিকতার সাথে লড়াই করতে থাকেন এবং যে-ই তার তরবারির সামনে আসত সে মারা পড়ত। অবশেষে হারেস জু শমীর দুই পুত্র আলা ও আওফা তার ওপর বৃষ্টির মতো তির বর্ষণ করে। একটি তির তার বুকে আঘাত করে, আরেকটি হাঁটুতে বিঁধে। কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী তির নিক্ষেপকারী ছিল দুরাইদ বিন সিম্মাহর পুত্র সালামা। আবু মুসা আশআরী (রা.) বলেন, আমি আবু আমের (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি, আপনাকে কে তির মেরেছে? তিনি এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করেন আর আমি (সাথে সাথে) তার পশ্চাদ্ধাবন করি, কিন্তু সে পালাতে থাকে আর আমার চ্যালেঞ্জ শুনে থামলে পরে আমরা তরবারি দিয়ে লড়াই করি এবং আমি তাকে হত্যা করি। ফিরে এসে আমি আবু আমের (রা.)-কে বলি, আল্লাহ্‌ তোমার হত্যাকারীকে জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছেন। আবু আমের আমাকে বলেন, আমার তির বের করো। তির তখনো শরীরে বিদ্ধ ছিল। তিনি বলেন, আমি যখন তার তির বের করি তখন তার ক্ষতস্থান থেকে পানি বের হয় যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়,আঘাত গুরুতর এবং বেঁচে থাকার আশা নেই। আবু মুসা আশআরী (রা.) বলেন, আবু আমের আমাকে বলেন, মহানবী (সা.)-এর সমীপে আমার সালাম পৌঁছে দিও। আর মহানবী (সা.)-এর সমীপে আমার জন্য ক্ষমা ও মার্জনা লাভের দোয়ার আবেদন কোরো। আমার ঘোড়া, আমার অস্ত্রও মহানবী (সা.)-এর সমীপে জমা দিও। আর একইসাথে আমাকে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন এবং পতাকা আমার হাতে দেন। এর কিছুক্ষণের মাঝেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আবু মুসা আশআরী (রা.) সেসব মানুষের সাথে যুদ্ধ করেন আর শত্রুরা পরাজিত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তাদের মাঝে কিছু লোক নিহত হয়। আবু মুসা সেখান থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও বন্দিদের নিয়ে মহানবী (সা.) সমীপে উপস্থি ত হন। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই তখন তিনি (সা.) রশি দ্বারা নির্মিত একটি চৌকির ওপর শুয়ে ছিলেন যাতে বিছানা ছিল না। অবশ্য বুখারী এবং অন্যান্য বর্ণনা অনুযায়ী সেটির ওপর বিছানাও ছিল; পাতলা চাদর জাতীয় কিছু বিছানো থাকবে হয়ত, যার ফলে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র শরীরে রশির চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল। তিনি (রা.) বলেন, আমি আওতাসের যুদ্ধের বৃত্তান্ত তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থাপন করি এবং আবু আমেরের শাহাদাতের কথা বলে তার দোয়ার আবেদনের কথাও উপস্থাপন করি। এতে মহানবী (সা.) পানি আনিয়ে নিয়ে ওযু করেন আর দুই হাত তুলে এই বলে দোয়া করেন: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِيْ عَامِرٍ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِّنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! উবায়েদ আবু আমেরকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্‌! কিয়ামত

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: Noor Jahan Begum, Kolkata

দিবসে তোমার সকল সৃষ্টিকুলের মাঝে সব মানুষের মাঝে উচ্চ মর্যাদায় তাকে অধিষ্ঠিত কোরো। আবু মূসা আশআরী বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার জন্যও ক্ষমা লাভের দোয়া করুন। তখন মহানবী (সা.) তার জন্য এই বাক্যে দোয়া করেন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهٗ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيْمًا অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আব্দু ল্লাহ্ বিন কায়েস (অর্থাৎ এটি আবু মূসা আশআরীর নাম ছিল), তার পাপ ক্ষমা করে দাও আর তাকে কিয়ামত দিবসে সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত কোরো। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৭২) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২০৬–২০৭) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৩১–৩৩৪] (শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৩২–৫৩৩) (তারিখুল খামিস,২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৩) (বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস–৪৩২৩)

এরপর রয়েছে যুল কুফফাইন অভিমুখে প্রেরিত তুফাইল বিন আমর দওসীর অভিযানের বর্ণনা। এটি অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘঠিত হয়েছিল। মহানবী (সা.)যখন হুনাইন থেকে তায়েফ অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন তখন মহানবী (সা.) তুফাইল দওসীকে যুল কুফফাইন নামক মূর্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। হযরত তুফাইল দওস গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি তার গোত্রের উচ্চমার্গের কবি, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি (হিজরতে আগে) মক্কার যুগে মহানবী (সা.)–এর সাথে দেখা করেন এবং তখনই মুসলমান হয়ে যান। বলা হয়, হুনাইনের যুদ্ধের পর তিনি নিজেই মহানবী (সা.)–এর কাছে যুল কুফফাইন নামক মূর্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে তাকে প্রেরণের জন্য আবেদন করেন। মহানবী (সা.) তাকে এই অভিযানের দলনেতা নিযুক্ত করে নির্দেশ দেন, সালামের অধিক প্রচলন করবে, অর্থাৎ শান্তির প্রসার ঘটাবে, মানুষকে খাবার খাওয়াবে; এমন নয় যে, তাদেরকে ক্ষুধার্ত মারবে; আল্লাহ্ তা'লাকে এমনভাবে লজ্জা করবে যেভাবে একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের লজ্জা পেয়ে থাকে; যখনই কোনো ভুল অথবা পাপ হয়ে যাবে– এর অনতিবিলম্বে পুণ্য করবে, কেননা পুণ্য পাপ মোচন করে দেয়।

তিনি (সা.) এভাবে উপদেশ দেন আর এরপর বলেন, নিজ জাতির লোকজনকে সাথে নেবে আর এই কাজ শেষ করে পুনরায় তায়েফ ফিরে আসবে। অতএব হযরত তুফাইল তার জাতির চারশ সদস্য সাথে নেন আর কাঠের তৈরি সেই মূর্তিতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেন আর ঠিক তখন তিনি এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করছিলেন: হে যুল কুফফাইন, শোনো! আমি তোমার উপাস্যের উপাসনাকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নই, কারণ তোমরা তো সবে সৃষ্টি হয়েছ। অথচ আমাদের জন্ম তোমাদের জন্মেরও আগে হয়েছে। দেখো! আমি তোমার ভেতর ও বাইরের সমগ্র অস্তিত্বকে আগুনের শিখায় ভরে দিয়েছি। তিনি (রা.) অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করার পর তায়েফে ফিরে আসেন। মহানবী (সা.) তায়েফে পৌঁছেছেন সবে মাত্র চার দিন হয়েছে, এরই মধ্যে হযরত তুফাইল চারশ সাহসী যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে তাঁর (সা.) কাছে আসেন এবং সে যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে আধুনিক সমরাস্ত্র অর্থাৎ 'মিনজানিক' (বড় গুলতির ন্যায় যুদ্ধাস্ত্র) ও 'দাবাবা' (ট্যাংক–এর ন্যায় যুদ্ধাস্ত্র) সঙ্গে আনেন। 'মিনজানিক' হলো এমন একটি যন্ত্র যার মাধ্যমে বড়ো বড়ো পাথর নিক্ষেপ করা হয়, অর্থাৎ বর্তমান যুগের কামানের মতোএকটি যন্ত্র। আর 'দাবাবা' হলো কাঠের একটি শক্তিশালী আবদ্ধ গাড়ির মতো, বর্তমানকালের সাঁজোয়াযানের মতো সেই যুগে জিনিস ছিল এটি। এর ভেতরে নীচ দিক থেকে কিছু লোক প্রবেশ করত আর দুর্গের প্রাচীর পর্যন্ত গিয়ে শত্রুর আক্রমণ থেকে বেঁচে প্রাচীরে ফাটল ধরাত। এই অস্ত্রটি প্রথমবার তায়েফের যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৭–৩৩৯] (তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১৯–১২০)(ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১২০) (ফিরোজুল লুগাত, পৃ: ১২৯১)

তায়েফের যুদ্ধ ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসের সংঘটিত হয়েছিল। তায়েফ মক্কার পূর্বদিকে অবস্থিত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মক্কার পূর্বদিকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে এ বিখ্যাত শহরটির অবস্থান ছিল। তায়েফ ছিল অতি দৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থান। তায়েফ নামকরণ হওয়ার কারণ হলো, এর চতুর্দিকে প্রতিরক্ষার জন্য প্রাচীর নির্মিত ছিল। এখানে সাকীফ গোত্র বসবাস করত, যারা ছিল অতি সাহসী। সমগ্র আরবে তাদের বিশেষ মর্যাদা ছিল, এমনকি তারা কুরাইশের সমতুল্য হিসেবে গণ্য হতো। তায়েফের প্রধান উরওয়া ইবনে মাসউদ–এর বিয়ে হয়েছিল আবু সুফিয়ানের কন্যার সাথে। মক্কার কাফিররা বলত, কুরআন যদি অবতীর্ণ হওয়ারই ছিল, তবে তা মক্কা বা তায়েফের কোনো সম্ভ্রান্ত নেতার ওপর অবতীর্ণ হতো।এখানকার মানুষ যুদ্ধ বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিল। তারা বলত, এই কুরআন তো বড়ো কোনো মানুষের ওপর অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল আর বড়ো মানুষ তো এই দুই নগরীতেই থাকে, এদের বাদ দিয়ে মুহাম্মদ (সা.)–এর ওপর অবতীর্ণ হওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? যাহোক তায়েফে একটি দৃঢ় ও মজবুত দুর্গ ছিল আর শহরের লোকেরা এক বছরের রসদের ব্যবস্থাও করে রেখেছিল। চারপাশে 'মিনজানিক' এবং বিভিন্ন স্থানে দক্ষ তিরন্দাজ মোতায়েন করা হয়েছিল।

এই যুদ্ধ আসলে ছিল হুনাইনের যুদ্ধের ধারাবাহিকতা, কারণ হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের অধিকাংশ পরাজিত লোকজন তাদের নেতা মালিক বিন অওফ নাসরীর সঙ্গে পালিয়ে তায়েফের দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই মহানবী (সা.) হুনাইন থেকে ফেরত এসে সমস্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও ছয় হাজারেরও বেশি যুদ্ধবন্দি মক্কার কাছে অবস্থিত জিরানা নামক উপত্যকায় পাঠিয়ে দেন আর নিজে তায়েফ অভিমুখে রওনা হন। জিরানা মক্কা ও তায়েফের রাস্তায় মক্কার কাছের একটি কূপের নাম, মক্কা থেকে যার দূরত্ব প্রায় সতেরো মাইল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি (সা.) বুদাইল বিন ওয়ারাকা বা হযরত মাসউদ বিন আমর গিফারী (রা.)–কে নিযুক্ত করেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সীরাতি খাইরিল ইবাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৮–৩৩৯) (আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ: ৫৬৭)

যাহোক, তিনি (সা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)–র নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী অগ্রে প্রেরণ করেন, যারা সেখানে গিয়ে দুর্গবাসীদের সঙ্গে অর্থাৎ তায়েফবাসীদের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করে, কিন্তু দুর্গবাসীরা এতে সাড়া দেয় নি। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদকে পাঠানোর পর মহানবী (সা.) নিজেও তায়েফের দিকে রওয়ানা হন। পথের দিশারীরা সাথে ছিল, তারা বাহিনীর আগে আগে পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল। পথিমধ্যে হুনাইনের যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর সেনাপতি মালিক বিন অওফের একটি দুর্গ পড়ে। মহানবী (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, এখানে কেউ বসবাস করছে? জানানো হয়, না, এটি খালি। তখন তিনি সেটি ধ্বংস করিয়ে দেন। এরপর সফর অব্যাহত রেখে তিনি তায়েফে পৌঁছান এবং তায়েফ দুর্গের নিকটে শিবির স্থাপন করে সেটি অবরোধ করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৮২) (আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ: ৫৬৭) (আললউল মকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩০৫) (কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯২৪–৯২৫) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৭]

তায়েফবাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই এ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারা দুর্গ মেরামত করে দৃঢ় করেছিল এবং এক বছরের খাদ্যশস্য প্রভৃতিও জমা করেছিল। আর হুনাইনের প্রান্ত রে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়ে যত লোক পালাতে পেরেছিল, তারা সবাই এই দুর্গে এসে আশ্রয় নেয় এবং দুর্গের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৮২) (আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ: ৫৬৭) (আললউল মকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩০৯)

মহানবী (সা.) প্রাথমিকভাবে তায়েফের অতি নিকটবর্তী একটি উন্মুক্ত ময়দানে শিবির স্থাপন করেন। তবে সৈন্যবাহিনী তখনও পুরোপুরি অবস্থান নেয় নি, দুর্গ থেকে তিরন্দাজরা প্রবলভাবে তির নিক্ষেপ করে অনেক মুসলমানকে আহত করে। সে সময় হযরত হুবাব বিন মুনযির মহানবী (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এটি আমাদের শিবির স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান নয়, কেননা তায়েফবাসীরা দক্ষ তিরন্দাজ আর তাদের তির অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছায়। সুতরাং তিনি (সা.) তাদেরকে নির্দেশ দেন, একটি যথাযথ স্থান নির্বাচন করো। এরপর একটি নতুন স্থানে পুরো সৈন্যবাহিনী স্থানান্তরিত হয়ে যায়। অবরোধের সময় উভয় পক্ষ থেকে তির ও পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটতে থাকে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) 'মিনজানিক' লাগিয়ে তায়েফবাসীর ওপর বড়ো বড়ো পাথর নিক্ষেপ করাতে থাকেন। এই 'মিনজানিক' সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, এটি হযরত তুফাইল দওসী যুল কুফফাইন অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। পাথর নিক্ষেপের ফলে একদিন দুর্গের প্রাচীরে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়। তখন মুসলমানদের একটি দল 'দাবাবা' নিয়ে– অর্থাৎ বড়ো বাক্সের ন্যায় সেই জিনিস, যার ভেতরে লোকেরা সুরক্ষিত থাকত– সেটি নিয়ে দুর্গের প্রাচীরের কাছে অগ্রসর হয় যেন সেখান দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু যখনই তারা অগ্রসর হয় তখনই দুর্গবাসীরা সেখানে লোহার জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করতে থাকে। 'দাবাবা'–য় অনেক চামড়াও ব্যবহৃত হতো যার

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

কারণে সেটিতে আগুন লেগে যায় আর সেখান থেকে মুসলমান যোদ্ধাদের বাইরে বের হয়ে আসতে হয়। আর যখনই তারা বাইরে বের হয়ে আসে তখন তায়েফবাসীরা তাদের লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করতে থাকে আর তাদের অধিকাংশকে শহীদ করে দেয়। সে সময় একবার মহানবী (সা.) তায়েফবাসীদের আঙুরের বাগান কর্তনের নির্দেশ প্রদান করেন। আমার মতে, এটি সর্বশেষ যুদ্ধকৌশল ছিল যা সম্ভবত ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল, কেননা পরবর্তীতে তিনি (সা.) এ রীতি রহিত করে দেন। প্রথমদিকে দুর্গবাসীরা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের সাথে বলে, আপনারা আমাদের বাগান জ্বালিয়ে দিলে জ্বালিয়ে দিন। আপনারা আমাদের মাটি ও পানি তো সাথে নিয়ে যেতে পারবেন না ! তারা নিজেদের ভূমির উর্বরতা নিয়ে অনেক গর্বিত ছিল আর তাদের একথার উদ্দেশ্য ছিল, আমরা পুনরায় চাষাবাদ করব, তাই আমরা ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু যখন প্রকৃত অর্থে (মুসলিম সেনারা) বাগানের কিছু অংশ নষ্ট করা শুরু করল, অর্থাৎ এ কথা বোঝাবার জন্য যে, তোমরা অহংকার করছ? তাহলে দেখো! আমরা তা কর্তন করছি। তখন সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ্ নামকতায়েফের এক নেতা মহানবী (সা.)-এর কাছে আবেদন করে, আপনারা আমাদের বাগান নষ্ট করছেন কেন? আপনারা যদি আমাদের ওপর জয় লাভ করেন তাহলে এ সবকিছু তো আপনাদেরই হয়ে যাবে। নতুবা আল্লাহ্‌র দোহাই এবং আত্মীয়তার দোহাই, আপনারা এমনটি করবেন না। একথা বলে সে নিবেদন করে, আল্লাহ্‌র খাতিরে আমাদের সাথে আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখুন; এমনটি করবেন না। তায়েফবাসীদের সাথে কুরাইশের অনেকের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। এটি না হলেও মহানবী (সা.)-এর যে আদর্শ ছিল তা এরূপই ছিল যে, তিনি কারো প্রতি কঠোরতা করতেন না। সুতরাং সুফিয়ানের এ আবেদনের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) সেই বাগানগুলো কর্তন পরিত্যাগ করেন এবং কর্তন করেন নি। [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৯] (আল লউলুল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩১২)

মহানবী (সা.) এবং সাহাবীগণ (রা.) এক পক্ষকাল বা ততধিক সময় পর্যন্ত তায়েফবাসীদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তায়েফবাসীদের হৃদয়ে বাস্তবিকই হুনাইনের পরাজয়ের এরূপ ভীতি ও প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তারা দুর্গের অভ্যন্তর থেকেই লড়াই করতে থাকে, বাইরে বেরিয়ে আসে নি। এই সময়ের ভেতর তাদের একজনও লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেনি।(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭১)

এমনকি একবার খালিদ বিন ওয়ালীদ যুদ্ধক্ষেত্রে বের হয়ে সাকীফের সাহসী ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ করেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানান, কিন্তু বার বার ডাকার পরও কেউ বাইরে বের হয়ে আসে নি, এমনকি সাকীফের নেতা আব্দে ইয়ালীল হযরত খালিদকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে, আমাদের কেউ তোমার সাথে লড়াইয়ের জন্য বাইরে আসবে না। আমরা নিজেদের দুর্গে সুরক্ষিত এবং আমাদের কাছে এক বছরের জন্য খাদ্য-রসদ আছে। আমাদের চিন্তার কিছু নেই। সেই দিনগুলোতেই হযরত ইয়াযীদ বিন যামআ (রা.) একবার দুর্গবাসীদের সাথে কথা বলার জন্য বলেন, তোমরা যদি আমাকে নিরাপত্তা দাও তবে আমি একটি কথা বলতে চাই। যদি তোমরা এই নিশ্চয়তা প্রদান করো যে, তোমরা আমার কোনো ক্ষতি করবে না,তাহলে আমি দূত হিসেবে আসতে চাই। তারা নিরাপত্তা প্রদান করে বলে, ঠিক আছে, নিরাপত্তা প্রদান করছি। তিনি (রা.) দুর্গের কাছে গেলে তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তার ওপর তির বর্ষণ আরম্ভ করে আর তিনি (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। তিনি (রা.) সেই যুদ্ধের প্রথম শহীদ ছিলেন। তিনি (রা.) উম্মুল মু 'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-র ভাগ্নে ছিলেন। তাকে হুযাইল বিন আবী সালত শহীদ করেছিল। সে তাকে শহীদ করার পর দাম্ভিকতার সাথে দুর্গের বাইরে বের হয়। সে মনে করেছিল, মুসলমানরা এই ঘটনার ফলে ভীত হয়ে গেছে, তাই তারা কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু সে দুর্গের দরজা থেকে বের হওয়ামাত্রই হযরত ইয়াযীদ বিন যামআ (রা.)-র ভাই ইয়াকুব বিন যামআ (রা.)- যিনি দুর্গের দরজার কাছেই লুকিয়ে ছিলেন- তাকে জাপটে ধরে নিয়ে এসে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত করে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সে আমার ভাইয়ের হত্যাকারী। অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়। [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৫১-৩৫৪] (গাযওয়ায়ে হুনাইন, বাশমীল, পৃ: ২২৩-২৩০)

এই বিবরণ এখনো আরো বাকি আছে। ইনশাআল্লাহ্, পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

নামাযের পর আমি দুটি গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। প্রথমটি হলো, মোকাররম ডক্টর সৈয়্যদ শাহাব আহমদ সাহেবের, ইদানিং তিনি কানাডায় বসবাস করছিলেন। মূলত তিনি ভারতের অধিবাসী ছিলেন। সম্প্রতি ৯৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তে কাল করেন,ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মরহুম মূসী ছিলেন। তার এক পুত্র ও তিন কন্যা আছে। তাদেরও সন্তানসন্ততি আছে। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী বিহার প্রদেশের অধিবাসী হযরত সৈয়্যদ ইরাদত হোসেন সাহেব (রা.)-র দৌহিত্র ছিলেন। তিনি আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সি টি থেকে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে এমএসসি করার পর মুজাফফরপুরে অবস্থিত বিহার ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি থেকে উক্ত বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৬৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র নির্দেশনায় কানাডা চলে যান। সেখানে তিনি ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর হিসেবে 'ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি' বিষয়ে পাঠদান করেন। নয় বছর যাবৎ তিনি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসেবে প্র্যাক্টিস করেন। মরহুমের বিভিন্ন সময়ে ভারত এবং কানাডায় জামা 'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। তিনি দীর্ঘকাল সিসকাটু ন জামা 'তের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। এর পূর্বে তিনি সেক্রেটারি তবলীগ হিসেবেও উত্তমভাবে সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর এডমন্টন-এ সেক্রেটারি ইশায়াত ছাড়াও তরবিয়্যত ও তালীম বিভাগে সেবা প্রদান করেন। সফল দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন। তার কয়েকটি বয়আত করানোর সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। কানাডা জামা 'তের ইতিহাস ইংরেজী ভাষায় লেখা হচ্ছে। সেটির একটি পর্যায় পর্যন্ত সংশোধনেরও তার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। কানাডার সিসকাটু নে কয়েকটি আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন আয়োজনের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে, যার ফলে সেখানকার শিক্ষিত শ্রেণির মাঝে জামা 'তের বার্তা পৌঁছেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তার 'ইসলাম ও আহমদীয়াত' সম্পর্কে বক্তৃতা করারও সুযোগ লাভ হয়েছে। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে জামা 'তের পুস্তকাবলিও রাখিয়েছেন। পাণ্ডিত্যের অধিকারী একজন ব্যক্তি ছিলেন। ইসলাম আহমদীয়াতের সমর্থনে ইংরেজী এবং উর্দু ভাষায় তার বিভিন্ন প্রবন্ধও জামা 'তের সংবাদপত্র ও সাময়িকীসমূহ ছাড়া অন্যান্য সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। তার উল্লেখযোগ্য একটি কর্ম হলো, ভারতের বিহার প্রদেশের আহমদীয়াতের ইতিহাসকে সংকলন করা। তার দুটি পুস্তক আছে- 'শোবা বিহার কে আসহাবে আহমদ' অর্থাৎ 'বিহার প্রদেশে আহমদ (আ.)-এর সাহাবীগণ' এবং 'শোবা বিহার কে শুহাদায়ে আহমদীয়াত অওর চান্দ ইবতেদায়ী মুখলেসীন' অর্থাৎ 'বিহার প্রদেশের আহমদীয়াতের শহীদগণ এবং প্রাথমিক যুগের কতিপয় নিষ্ঠাবান ব্যক্তি'- এই দু টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে; চমৎকার পুস্তক। বিহার প্রদেশের আহমদীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে তাদের ঘটনাবলি একত্রিত করেন। তার তৃতীয় আরেকটি বই 'বিহার প্রদেশে আহমদীয়াত'-ও সম্পন্ন হয়েছে। এটি ইংরেজী ভাষায় লিখিত। একজন পুণ্যবান, মুত্তাকী বুযুর্গ এবং একজন অনুকরণীয় আহমদী ছিলেন। সর্বদা ইসলামী বিধিবিধান পালন করাকে নিজের প্রথম কর্তব্য বলে মনে করতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খিলাফতের প্রতি তার একান্ত বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা ছিল। তার পুত্র সৈয়দ মোবারক সাহেব বলেন, তার পুরো জীবনের একটিই লক্ষ্য ছিল ,আর তা হলো আল্লাহ্ তা 'লার সন্তুষ্টি অর্জন। দৈনিক পাঁচ বেলার নামায নিষ্ঠার সাথে আদায় করতেন। ইবাদতের প্র তি তার একটি বিশেষ অনুরাগ ছিল। পড়ালেখা এবং শেখার প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। জীবনের শেষ দিনগুলোতেও নতুন নতুন বইপুস্ত ক ক্রয় করতেন এবং বার্ধ ক্য সত্ত্বেও নিয়মিত জুমু আর নামাযে অংশ নিতেন। মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে ওয়েস্টার্ন কানাডার জলসায় অংশ নিয়েছিলেন। তবলীগের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন মফস্বল অঞ্চলে গিয়ে মানুষের কাছে তবলীগ করতেন। প্রতিটি বিষয়ে যুগ-খলীফার দিকনির্দে শনা গ্রহণ করতেন। আমার কাছেও তিনি অনেক চিঠি লিখে পাঠাতেন এবং নিজের লেখা বইও আমাকে পাঠিয়েছেন। চাঁদা প্রদানে সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন। নিজ জীবনের শেষ চার বছরের উপার্জ নের এক পঞ্চমাংশ ওসিয়্যত খাতে আদায় করেন। আল্লাহ্ তা 'লা তার প্রতি ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হচ্ছে লাহোর নিবাসী মোবারক খোকর সাহেবের, যিনি ইনশাআল্লাহ্ খোকর সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ৮১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন,ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি গুজরানওয়ালা নিবাসী শহীদ আফযাল খোকর সাহেব ছোটো ভাই এবং শহীদ আশরাফ খোকর সাহেবের চাচা ছিলেন। তাদের পরিবারেদু ইজন শহীদ রয়েছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র সঙ্গে তার বিশেষ আন্তরিক সম্পর্ক ছিল; তিনি (রাহে.) তার বিয়ে দিয়েছিলেন। খিলাফতের পূর্বেও খলীফা রাবে (রাহে.)-র সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র আহ্বানে তিনি করাচিতে ব্যবসা শুরু করেন এবং সফলও হন। যদিও জামা 'তের কোনো বড়ো দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয় নি, তবে জামা 'তের কোনো কাজের জন্য যখনই ডাকা হতো তিনি সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হতেন। জামা 'তও খিলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। অত্যন্ত মিশুক, স্নেহশীল এবং মানুষের কষ্ট অনুভব করতেন ও তা সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। জনকল্যাণমূলক কাজগুলোতে তিনি বেশি বেশি অংশ নিতেন। তিনি তার মরহুমা মায়ের নামে একটি শিক্ষাবৃত্তিও চালু করেছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি স্ত্রী, এক কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা 'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করুন। (আমীন)

(আল ফজল ইন্টার ন্যাশনাল, ৩রা অক্টোবর, ২০২৫)

****

আমাদের মাহদীর দুইটি লক্ষণ রয়েছে যখন থেকে আকাশ ও পৃথিবীর ভিত রচনা করা হয়েছে সেই লক্ষণ কোন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ বা নবীর জন্য প্রকাশিত হয় নি। সেই নিদর্শন হল চাঁদের নির্ধারিত তারিখগুলোর প্রথম রাতে এবং সূর্যের নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিনে রমযান মাসে গ্রহণ লাগবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! আমার আগমনের দুটি উদ্দেশ্য এক এখন ইসলামের জন্য যে বিজয় নিহিত সেই আনুগত্য ও ইসলাম হারিয়ে ফেলছে বা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ইসলাম অনাথ শিশুর মতো হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি বাতিল ধর্মের আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করি সত্যতা প্রকাশ করি।

এসব বিষয় তোমাদের চিন্তাভাবনার জন্য যাদেরকে আল্লাহ তা'লা বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন। যদি তাদের চোখে পর্দা আবৃত না হয় আর ন্যায় নীতির দাবির ভিত্তিতে তারা যদি যাচাই-বাছাই করে তাহলে তাদের মানতে হবে যে যুগের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত সময় মসীহ্ এবং মাহদীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে খোদার পক্ষ থেকে এসেছেন। আর বিগত ১৩৬ বছর ধরে আহমদী জামা'তের ইতিহাস এই কথার সাক্ষী। নিশ্চয় খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থন তার সঙ্গে আছে এবং তার জামা'তের সঙ্গে আছে।

বর্তমান সময়ে তথাকথিত আলেম সমাজ হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি এই অপবাদ আরোপ করে যে, নাউযুবিল্লাহ তিনি মসীহ্ ও মাহদী হওয়ার দাবি করে মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করেছেন। অথচ এটি এমন একটি মিথ্যা অপবাদ যার কোন বাস্তবতা নেই, যা ভিত্তিহীন এবং অনর্থক।

যখন আমরা নিজেদের মাঝে সত্যিকার বিপ্লব সৃষ্টি করব তখনই আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যিকারের সাহায্যকারী হতে পারব। আর সত্যিকার সাহায্যকারী হয়ে বিশ্ববাসীকে ইসলামের ক্রোড়ে আনতে পারব এবং খোদার একত্ববাদ বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। আর বিশ্ববাসীকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে একত্র করতে পারব। আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে এর সামর্থ্য দান করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা ২০২৫ উপলক্ষ্যে সমাপ্তিঅধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, বর্তমান সময়ে তথাকথিত আলেম সমাজ হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি এই অপবাদ আরোপ করে যে, নাউযুবিল্লাহ তিনি মসীহ্ ও মাহদী হওয়ার দাবি করে মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করেছেন। অথচ এটি এমন একটি মিথ্যা অপবাদ যার কোন বাস্তবতা নেই, যা ভিত্তিহীন এবং অনর্থক। এদের মাঝে যদি কিছুটা লজ্জা এবং শালীনতা থাকত, তাহলে তারা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক পড়লে জানতে পারত যে, তিনি কী বলেছেন। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা কী বলেছেন এবং মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে কী বলেছেন। তিনি (আ.) তো এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমি যা কিছু পেয়েছি তা মুহাম্মদ (সা.) এবং তার মধ্যস্ততায় তাঁর কল্যাণে পেয়েছি। আমার দাবি হুবহু মহানবী (সা.) এবং কুরআনের পবিত্র বাণীসম্মত। আমাকে আল্লাহ তা'লা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য মনোনীত করেছেন এবং আমি ইসলামের নবজাগরণের জন্য এসেছি। আজ এ যুগে মসীহ্ এবং মাহদীর আগমনের যে সুসংবাদ মহানবী (সা.) এবং আল্লাহ তা'লা দিয়েছেন- ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা পৃথিবীবাসীর সামনে উপস্থাপন করে বিশ্ববাসীকে মহানবী (সা.)-এর পতাকা তলে আনার কথা। আমি আল্লাহ তা'লার নির্দেশে শুধুমাত্র সেই দাবিই করেছি। আমি নিজের পক্ষ থেকে নতুন কোন মনগড়া কথা বা মিথ্যা কোন দাবি করি নি। তিনি (আ.) ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলো এবং আমি নাকি এই ব্যাবসা বাড়ানোর চেষ্টা করছি। তোমরা আমাকে বলো, মুসলমানরা কি শোচনীয় অবস্থায় নেই? মুসলমানদের ব্যবহারিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল নয় আর চারিদিক থেকে ইসলামের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। এ যুগের অবস্থা সম্পর্কে মহানবী (সা.) এবং পবিত্র কুরআনে যে নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্ব আজ আল্লাহ তা'লা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এখনও যদি কোন সংস্কারক না থাকে যিনি আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা প্রচার করতে আসবেন। যিনি মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে তার অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা বিশ্বময় প্রচার করতে আসবেন। যদি এখনও সময় না হয়ে থাকে তাহলে তিনি কবে আসবেন? তিনি সেই যুগের অবস্থা তুলে ধরে বলছেন আর এটি সেই যুগ, যেই যুগে এই অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছে। আর সেই যুগের প্রয়োজনে একজন সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী যুগের চিত্র অঙ্কন করছে। তাঁর মসীহ্ মাওউদ হবার দাবির পাশাপাশি আল্লাহ তা'লার সাহায্য এবং সমর্থন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা বুঝতে চাচ্ছো না অনুধাবনও করছ না।

তিনি (আ.) বলেন, যখন তিনি দাবি করেছিলেন তখন ইসলামের ওপর বিধর্মীরা বিশেষত খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে এমন জোরালো আক্রমণ হচ্ছিল যে, কয়েক লক্ষ মুসলমান ভারতবর্ষে খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিল পুরো ভারত উপমহাদেশে। তিনি বলছেন, এখনও কি কোন সংস্কারক আসার প্রয়োজন নেই? তিনি ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা পৃথিবীতে প্রচার করবেন। তিনি এই বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে বিশ্ববাসীর দরবারে উপস্থাপন করবেন আর মানুষকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করবেন। হুযূর (আই.) বলেন বর্তমানে আমরা দেখছি ইসলামের ওপর এই আক্রমণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও তাদের রীতি পাল্টে গেছে কিন্তু আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে এই আক্রমণ খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে ইসলামের ওপর হচ্ছে। এবং এখনও মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। নাস্তিকতার দিকে যাচ্ছে বা ইসলাম পরিত্যাগ করছে তা মুখে বলুক বা না বলুক মানুষকে যখন নিভৃতে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন অগণিত এমন অনেক মানুষ বা মুসলমান আছে যাদের ওপর যখন কোন জরিপ চালানো হয় তখন এমন চিত্র সামনে আসে যাদের খোদার সাথে কোন সম্পর্কই নেই সবই খোদা থেকে দূরে সরে গেছে। খোদাকে অবিশ্বাস করে আর ইসলামের সাথে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। তারা নামে মাত্র মুসলমান আর এই বিষয়ে না মুসলমান নেতাদের কোন চিন্তা আছে, আর না আলেমদের কোন চিন্তা আছে। সবাই তাদের নিজ গদি বাঁচানোর চিন্তা করছে। যে-সব মুসলমান দেশকে আল্লাহ তা'লা সম্পদ দিয়েছেন তারাও এদিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। আর সেসব মুসলমান দেশ যেখানে অঢেল অর্থ সম্পদের ঘাটতি আছে কিন্তু আল্লাহ তা'লা তাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়েছেন, তারাও নিজেদের গদি বাঁচানোর চিন্তায় ব্যস্ত। মানুষকে খেপিয়ে দিয়ে পরস্পরকে হত্যা করছে। ব্যক্তিস্বার্থে মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করছে এজন্য বিধর্মীরাও সাহস পাচ্ছে তারাও মুসলমানদের ওপর নির্বিচারে অন্যায় অত্যাচার করছে। আর এগুলো আমরা এখন বিশ্বের সর্বত্রই দেখছি। পত্রপত্রিকায় যদি আপনি চোখ বুলান তাহলে দেখতে পাবেন যে মানুষ ধর্মকে ভুলে গেছে। কারও মাঝে তবলীগের জন্য কোন বেদনা বা

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

বাসনা নেই। আল্লাহ তা'লার বাণী বিশ্ববাসীর দরবারে পৌঁছানোর এবং মানুষকে সত্যিকার মুসলমান বানানোর চিন্তা কারও নাই যদি চিন্তা থেকে থাকে তাহলে তা এক ব্যক্তির মাঝেই রয়েছে এবং ছিলআর তিনি তার জামা'তের মাঝেও তা সৃষ্টি করে গেছেন, কিন্তু তাকে মানার জন্য এরা প্রস্তুত নয়।

এই যুগের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, হে মুসলমানগণ! যারা মুসলমানদের বেঁচে যাওয়া প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী এবং যারা পুণ্যবান মুসলমানদের সন্তান তোমরা অস্বীকার করা ও কুধারণা পোষণে তাড়াহুড়া কোরো না। আর সেই ভয়ানক পরিণতিকে ভয় করো যা তোমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে আর অগণিত মানুষ এদের প্রতারণার ফাঁদে পড়েছে। তোমরা দেখো কত দ্রুত ইসলাম ধর্মকে নির্মূল করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তোমাদের কি এটি দায়িত্ব নয় যে, তোমরাও চেষ্টা করো? ইসলাম মানুষের পক্ষ থেকে নয় যা মানুষের চেষ্টাপ্রচেষ্টায় ধ্বংস হয়ে যাবে। পরিতাপ তাদের জন্য! যারা একে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এরপর পরিতাপ তাদের জন্য যারা নিজেদের নারী এবং শিশু ও ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার জন্য সবকিছু ব্যয় করছে যা তাদের কাছে আছে, কিন্তু ইসলাম-সেবার জন্য তাদের কাছে কিছু নেই। ইসলামে শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা কোন চেষ্টাপ্রচেষ্টা করতে চায় না আর কিছুই ব্যয় করে না। তিনি (আ.) বলেছেন, হে দুর্বলরা! হে ভীতরা! তোমাদের জন্য চিন্তা হচ্ছে। তোমরা আল্লাহর বাণী ও ধর্মে নূর প্রচার করার জন্য কোন শক্তি রাখো না, কিন্তু খোদা তা'লার প্রতিষ্ঠিত যে কারখানা, যিনি খোদা তা'লার ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করার জন্য এসেছেন তাকেও তোমরা গ্রহণ করছ না। তিনি যে দাবি করেছেন, তাকে আল্লাহ তা'লা ইসলামের সৌন্দর্য প্রচার করার জন্য পাঠিয়েছেন তাকে তোমরা গ্রহণ করছ না, বরং তার বিরোধিতা করছ। বর্তমানে ইসলাম সে প্রদীপের মতো যা একটি সিন্দুকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে অথবা সেই সুমিষ্ট পানির ঝরনাধারার মতো যা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা কেউ উপকৃতহতে পারছে না। পানির ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি (আ.) বলছেন, ইসলাম তো এখন পতনের দিকে, তাই একটু তো চিন্তা করো, কিছুটা বিবেকবুদ্ধি খাটাও। ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর চেহারা সাধারণভাবে মুসলমানদের অবস্থা দেখলে সেই সুন্দর চেহারা আর দৃশ্যমান হয় না।

সম্প্রতি একটি জরিপ চালানো হয়েছিল এখানে রিপোর্ট এসেছে ইউকে-তে সবচেয়ে বেশি হিজরতকারী শরণার্থী মুসলমানদের বিরোধী। ইসলাম সম্পর্কে তাদের মনে ভুল চিন্তাধারা সৃষ্টি করা হয়েছে। কিছু মানুষ এখানে যারা এসেছে তাদের মধ্য এই ধ্যানধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, তাদের কার্যক্রম ঠিক নয়। আর কিছু হচ্ছে মুসলমান নামধারী নেতা যাদের ভুল শিক্ষার কারণে এই প্রভাব সমাজে সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম বিরোধীদের উত্তর সর্বদা এটি হয় যে, ইসলামের শিক্ষা উগ্রতার শিক্ষা, সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা, এরা আইন ভঙ্গাকারী এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আর ইসলামের নৈতিকতার অবমূল্যায়নকারী। ইসলাম সম্পর্কে সমাজে এই ধরনের ধ্যানধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। পাশ্চাত্য জগৎ এজন্য ইসলাম বিরোধী, কেননা মুসলমানদের মাঝে ইসলামের সঠিক আদর্শ তারা দেখতে পাচ্ছে না, যেমনটি আমি বলেছি। অতএব তিনি (আ.) বলেছেন, মুসলমানদের আবশ্যক দায়িত্ব ছিল ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রকাশ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। আর সম্পদ তো দূরের বিষয়, উচিত ছিল নিজেদের রক্ত পানির মতো বইয়ে দেওয়া, কিন্তু ইসলামের সেবায় তারা এমনটি করে নি। তারা তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে এমন চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত। ইসলাম সম্পর্কে পূর্ববতী যে শিক্ষামালা রয়েছে সেটি কি যথেষ্ট নয় পূর্বের আলেমগণ ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে যেটি বলে গেছেন সেটিও কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? তারা জানে না, আধুনিক নৈরাজ্য দূর করার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের যে-সকল আবিষ্কার রয়েছে সেটিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন। সব যুগে যখনই অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে তখন নবী রসূল বা সংস্কারক এসে থাকে। তখন কি পূর্ববতী গ্রন্থসমূহ ছিল না? প্রথমত, তাদের আমল এমন নয় যার মাধ্যমে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা তারা তুলে ধরতে পারবে। এরপরও তারা আনন্দিত যে তাদের শিক্ষা পরিপূর্ণ। আর ইসলামের এই অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরার জন্য আল্লাহ তা'লা ইমাম মাহদী (আ.)-কে পাঠিয়েছেন। আর এ যুগেও তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাকে পাঠিয়েছেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বিরুদ্ধবাদীদের যে আপত্তি, হুযূর (আই.) বলেন, এটিও নতুন ধরনের আপত্তি। আর এগুলোকে খণ্ডন করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে আসার প্রয়োজন ছিল এবং আছে। যিনি পবিত্র কুরআনের আলোকে তাদের আপত্তির মোতাবেক কড়া জবাব দেবেন, কিন্তু মৌলবি এবং নামধারী আলেম ওলামাগণ এই সাধারণ মুসলমানগণকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, ভুল শিক্ষা দিচ্ছে। তিনি (আ.) এই বিষয়টিকে বুঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, হে ভাইগণ! এটি আবশ্যক অন্ধকার প্রসারের সময় আকাশ থেকে আলো অবতীর্ণ হয়। কার্যত অনেকে ধর্ম সেবার দাবি করে থাকে, কিন্তু যেভাবে শিক্ষা দেয় তা উগ্রতার শিক্ষা। ইসলামের শিক্ষা তো প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসার শিক্ষা। এজন্য আল্লাহ তা'লা কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তির সাথে যোগ দেওয়া আবশ্যক।

তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা সূরা কদরে বলেছেন বরং মুমিনদের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাঁর বাণী ও তাঁর নবী লাইলাতুল কদরে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর প্রত্যেক সংস্কারক ও মুজাদ্দেদ খোদার পক্ষ থেকে লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ হন। তোমরা ভাবতে পারো লাইলাতুল কদর কাকে বলে বা কী জিনিস বা এর মূল্য কী? লাইলাতুল কদর হল সেই অন্ধকার যুগের নাম যে যুগে অমানিশা ও ঘোর অন্ধকার চরম রূপধারণ করে তখন এক নূর যেন অবতীর্ণ হয়। এই অমানিশা ও ঘর অন্ধকার দূর করার জন্য। আর সেই নূরের নাম রূপকভাবে লাইলাতুল কদর রাখা হয়েছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটি একটি রাত নয় বরং এটি যুগের কথা বলা হয়েছে যা জুলুম অন্ধকার এবং অমানিশার ছেয়ে গেছে। নবীর সত্তার মৃত্যুবরণের পর হাজার মাস যা মানুষের আয়ুস্কাল যা এক যুগকে শেষ করে এবং মানুষের কামনা-বাসনার সংবাদ দেয় এটি দূরে চলে যায় আর তখন এই রাত ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়। তখন আকাশ থেকে এক নয় বরং একাধিক সংস্কারকের বীজ রোপন করা হয়। যারা নতুন শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভাবের জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি নেয় আর আল্লাহ তা'লা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে "লাইলাতুল কদরি খাইরুম মিন আলফি শাহর"। এই লাইলাতুল কদরের নূর সেই ব্যক্তি দেখতে পারে এবং যুগের সংস্কারক থেকে লাভবান হতে পারে। সেই এক হাজার বছরের চেয়েও শ্রেয় যে এই অন্ধকার যুগে লাইলাতুল কদর পেয়েছে। তিনি বলেছেন, যদি এই একটা বছরও পাও তাহলে একসাথে সেই হাজার মাসের চেয়েও উত্তম যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর কেন উত্তম এজন্য যে এই লাইলাতুল কদরে ফেরেশতা, রূহুল কুদ্দুস, সেই সংস্কারক এর সাথে উর্ধ্বলোকে আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়। বৃথা আসে না, বরং সচেতন হৃদয়ে অবতরণের জন্য এবং শান্তির পথ খোলার জন্য। আর সেই পথ খোলা এবং পর্দা উন্মোচনে সে রত থাকে। যতক্ষণ না উদাসীনতা ও অন্ধকার দূর হয়ে হেদায়েতের প্রভাত উদিত হয়।

আমরা জামা'তে দেখি, আল্লাহ তা'লার ফযলে আমি রিপোর্টে উল্লেখ করেছি গতকাল, শত শত হাজার হাজার মানুষ প্রত্যেক বছর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করে জামা'তভুক্ত হয়ে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের গণ্ডিতে প্রবেশ করছে। তারা হঠকারিতা প্রদর্শন করে না। সবার উচিত হঠকারিতা না দেখিয়ে চিন্তা করা। এরপর দেখুক যে, আল্লাহ তা'লা আমাদের কাছে কী চায়? আর ইসলামের সৌন্দর্য আমরা কীভাবে প্রকাশ করতে পারি। এজন্য সেই ব্যক্তির সন্ধান করা উচিত যাকে আল্লাহ তা'লা পাঠিয়েছেন বা প্রেরণ করেছেন। আর আপনারা গ্রহণ করার জন্য সোচ্চার হন। হে মুসলমানগণ! এই আয়াতগুলো মনোযোগসহকারে পাঠ করুন। আল্লাহ তা'লা এই যুগের বা এ যুগকে কীভাবে তাতে তুলে ধরেছেন যাতে প্রয়োজনের সময় সংস্কারকে প্রেরণ করা হয়। 'ইন্না নাহনু নায্যলনায যিকরা' অর্থাৎ 'ইন্না আনযালনাহু ফউ লাইলাতুল কদর।' দেখো এবং বোঝো! তোমরা কি এমন যুগকে মূল্যায়ন করবে না? তোমরা কি খোদার কথা কে হাসিঠাট্টার দৃষ্টিতে দেখবে? যেটি তো লজ্জার বিষয় এ যুগ এমন এক যুগ যা সহজাতভাবে দাবি করত যেভাবে বিরোধীদের বিরোধিতার বন্যা চতুর্দিক থেকে কীভাবে ধেয়ে আসছে? আর চতুর্দিক থেকে এটিকে প্রতিহত করা উচিত এবং এর ভেতরে চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনা হয়ে গেছে। তাই আল্লাহ তা'লা চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে স্বীয় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যা কিনা 'ইন্না নাহনু নায্যালনায যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন'- অনুসারে এই নৈরাজ্যের মোকাবিলার জন্য একজন সংস্কারক পাঠিয়েছেন, কিন্তু যেহেতু খোদার দৃষ্টিতে সব মুজাদ্দেদের একটা নাম থাকে। কোন ব্যক্তি যখন একটি বই লেখে তখন তার বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে বইয়ের একটি নাম রাখে। একইভাবে আল্লাহ তা'লা এই মুজাদ্দেদের নাম তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব অনুসারে মসীহ্ রেখেছেন, কেননা নির্ধারিত ছিল পূর্বে থেকে যে শেষ যুগে এক ক্রুশীয় নৈরাজ্যের সংশোধন করবেন মসীহ্ ইসা। মসীহ্ মাওউদের জীবদ্দশায় এই ফিতনা চরম রূপধারণ করেছিল আর প্রকাশ্য বিরোধিতা হতো, কিন্তু এখন নতুনভাবে হামলা করা হয়। এখন এই ইসলামে আক্রমণে নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করছে। ইসলামের বিরোধিতায় ইসলাম বিরোধী শত্রুরা ইসলামকে নির্মূল করার জন্য এমন কোন কাজ নেই যা তারা করছে না। আমরা কি এটি দেখি না? আমরা এটি দেখি কিন্তু মুসলিম বিশ্ব এটি বোঝে না। আর এর চিকিৎসা কিন্তু কোন যুদ্ধবিগ্রহ নয় বরং এর চিকিৎসা হল ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষার মাধ্যমে তাদের হৃদয় জয় করে আল্লাহ তা'লার বান্দা বানানো। বিরুদ্ধবাদীদের হৃদয় জয়

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB**

করার মাধ্যমে এটি করা সম্ভব। যে ব্যক্তির ওপরে এই সংশোধনের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়েছে তার নাম মসীহ্ মাওউদ রাখা আবশ্যক ছিল। অর্থাৎ চিন্তা কর 'ইয়াকসিরুস সালীব' অর্থাৎ ক্রুশভঙ্গ করার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত। এটি মসীহ্ মাওউদ-এর ওপর ন্যস্ত। এটি কি সেই যুগ নাকি অন্য কোন যুগ একটু ভাবো? আল্লাহ তোমাদের বোঝার শক্তি দিন। এই সময়কার অবস্থা অনুসারে তিনি গভীর মর্মবেদনা নিয়ে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর এমন পরিস্থিতি আজও আমরা দেখছি। যদিও ব্যাহত ধর্মীয় নাম নিয়ে এতে বিরোধিতা করা হয় না। আপাতত দৃষ্টিতে এরা এটি বলে যে, ধর্মের কারণে আমরা বিরোধিতা করছি না, কিন্তু এটি একটি দাজ্জালের ষড়যন্ত্র। তারা ভিন্ন নামে ইসলামের ওপর আক্রমণ করে।

এরপর যুগের প্রয়োজনে এবং সংশোধনের আবশ্যক সম্পর্কে এক জায়গায় বলেন, এটি কি প্রমাণিত বিষয় নয়, আগমনকারী মসীহ্ মাওউদ সেই যুগে আসা উচিত যে যুগে আমরা রয়েছি? তিনি বলেন, বুখারী শরীফ– যেটিকে কুরআনের পর সবচেয়ে সঠিক গ্রন্থ আখ্যায়িত করা হয় তাতে লেখা আছে যে, মসীহ্ মাওউদ ক্রুশ ভঙ্গ করার জন্য আসবেন। আর এমন সময় আসবেন যখন দেশে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে সীমালঙ্ঘন দৃষ্টিগোচর হবে– কথা এবং কাজে। তাই এখন উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য বেশি চিন্তার প্রয়োজন নেই। খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব লক্ষ লক্ষ হৃদয় পড়েছে এখন প্রকাশ্য না হলেও অভ্যন্তরীণভাবে ইসলামে এমন বিরোধিতা হচ্ছে তা আপাততঃ দৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। আর দেশে বিভিন্ন প্রকার অবৈধ বিষয় বৈধকরণের পন্থা বা রীতি দেখা যায়। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ভয়াবহ বিরোধিতা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য যা সামনে আসে তা থেকে বোঝা যায় সব দেশে উগ্রপন্থি মোল্লাদের আচরণের কারণে মানুষ ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ইসলামকে খণ্ডন করে বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে। অনেক বই গালিতে পরিপূর্ণ এমন বই লেখা হচ্ছে তাতে মহানবী (সা.) এবং ইসলামকে গালি দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, যদি আমরা দেখি গত ১৩০০ বছর এমন বিরোধিতা এবং ইসলামের উপরে এমন হামলা হতে দেখা যায় না। যা আজকাল ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য করা হচ্ছে। বিভিন্ন বই ছাপা হচ্ছে, বক্তৃতা করা হচ্ছে অন্যান্য অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এসব কিছু সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী করা হচ্ছে যা ১৩ শতাব্দীতে হবার কথা ছিল। আর এ কারণেই মসীহ্ মাওউদ আসার কথা। যারা ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত তারা জানে যে, তার দাবির যুগে মুসলমানরা কীভাবে ইসলাম ছেড়ে ত্রিত্ববাদে নাস্তিকতার ঠাঁই নিচ্ছিল। এখনও নামসর্বস্ব শিক্ষিত শ্রেণি কার্যত তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কোন কোন বৈঠকে তারা মুসলমান হিসাবে নিজের পরিচিতি তুলে ধরতে লজ্জাবোধ করে। মহানবী (সা.) এবং কুরআনের অবমাননায় কেন বিভিন্ন কিতাব লেখা হচ্ছে, বই লেখা হচ্ছে, নারা উচ্চকিত করা হচ্ছে? এই কারণে যে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরে লোকদের আপত্তির খণ্ডন তুলে ধরার সামর্থ্য তাদের নেই। ইসলামের শিক্ষা সুন্দরভাবে কেন তারা তুলে ধরে না দাবি তো অনেক করে থাকে। এ কারণে এই কাজ আল্লাহ তা'লা তার প্রেরিত মহাপুরুষের কাছে ন্যস্ত করেছেন। তার জামা'তের কাঁধে ন্যস্ত করেছেন। অতএব আজ সব আহমদীদের দায়িত্ব হল ইসলামের সুন্দর শিক্ষা পৃথিবীতে প্রচার ও প্রসার করা কর্ম ও নিজের আমলের মাধ্যমে তা প্রচার করা। তিনি বলেছেন যে, সুস্থ বিবেক এই প্রয়োজন অনুভব করে, এমন আশঙ্কাপূর্ণ যুগে যখন পৃথিবীতে সর্বত্র বিরোধিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে; মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও উল্লেখ করার যোগ্য নয়, ক্রুশীয় নৈরাজ্যকে দূর করার জন্য এবং অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা আনার জন্য কোন সংস্কারক প্রয়োজন। এটি প্রমাণ করছে যে, বিষাক্ত বাতাসের সংশোধন যা প্রবল বেগে বইছে যা মহামারির মতো সকল শহর গ্রামের কিছু অংশকে নিজের ঝুলিতে ভরছে। এটি কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয় বরং পৃথিবীতে একটি জোশ সৃষ্টি হয়েছে এবং নিজের বিষ পুরোটাই বের করে দিয়েছে। তাই এটিকে দূর করার জন্য ঐশী বা উর্ধ্বলোকের কোন শক্তির প্রয়োজন। তিনি বলেছেন যে, এটি থেকে বুঝা যায়, এটি মসীহ্ মাওউদ এর যুগ আর এটি সহজেই বুঝা যায়, মসীহ্ মাওউদ আগমনের উদ্দেশ্য ক্রুশকে ভঙ্গ করা আর বর্তমানে ক্রুশীয় ধর্মের যে ত্রাশ পরিলক্ষিত হয় তা এত ভয়াবহ যে, এর চেয়ে ভয়ের আর কিছু ভাবা যায় না। তাই এখন যদি আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে এটির মোকাবিলা করা না হয় তাহলে কোন সময়ের জন্য মানুষ এটির মোকাবিলা করার জন্য অপেক্ষা করছে?

তিনি আরো বলেন, চতুর্দশ শতাব্দীর ১৭ বছর কেটে গেছে অর্থাৎ যখন তিনি একটি লিখেছেন তখন ১৭ বছর কেটে গেছে। এখন পর্যন্ত যদি মসীহ্ না আসে তাহলে মানতে হবে যে, আল্লাহ আরো শত বছর বা তার চেয়ে বেশি কাল ইসলামকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের লক্ষ্যে পরিণত করবেন। মুসলমানরা কি এই বিশ্বাস করে? তিনি এক পঙ্ক্তিতে বলেন, সময় ও যুগ মসীহ্ আসার সময় ছিল আমি না আসলে অবশ্যই অন্য কেউ আসত। অবশ্যই আসার কথা যেমনটি তিনি বলেছেন। এখন এই কথারও শত বছর পার হয়ে গেছে। তার আগমনের ১০০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এখনও তারা অপেক্ষা করছে। আবার এ কথা বলছে যে, সে তো আসবেই না। অতএব প্রণিধানের বিষয় এটি যে, এখনও মসীহ্ মাওউদ আসলেন না এবং ইসলামের অবস্থার প্রতি কারও কোন মনোযোগও নিবদ্ধ হচ্ছে না। নামধারী মুসলমানরা যে একথা বলে যে আমরা ইসলামের মোকাবিলা করছি। কিন্তু তাদের প্রতিরক্ষা কি? কেবলমাত্র ইসলামকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করা হচ্ছে। খোদা তা'লা কি তার চির প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন না? মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কি পূর্ণ হবে না? মহানবী (সা.)-এর অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী আছে আর অবশ্যই তা পূর্ণ হবে, কিন্তু যাদের চোখ আছে তারা দেখতে পাবে যে আল্লাহ তা'আলা কীভাবে তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করছেন। অনেক মানুষ এবং অনেক দল ইসলামের সেবার নামে অনেক কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু ইসলামের সেবা তারা উগ্রতা এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে করতে চায় আর তারা তাদের বিরোধীদের কাছ থেকেও অস্ত্র সাহায্য নেয় বা নিজেরা কোন ইসলামী দেশে যদি অস্ত্র নির্মাণ করেও তাহলে সেটি এমন যোগ্য নয় যেটি দ্বারা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবে। এরপর তাদের যদি সেই অমুসলমানদের কাছেই ঝুঁকতে হয় তাহলে এমন মোকাবিলা করার উপকার কী? যদি তোমরা মোকাবিলা করতেই চাও তাহলে নিজেদের মাঝে সাহস সৃষ্টি করো এবং সব দিক থেকে ইসলামের মোকাবিলা করো। আজকাল ইসলামের ওপর এবং মুসলমান দেশগুলোর ওপর আক্রমণ হচ্ছে, কে আছে যে তাদের সাহায্য করছে? তারা একে অপরের পক্ষেও তো বলতেই চায় না কে তাদের পক্ষে বলছে। যদি কেউ চিন্তা করে থাকে তাহলে এই চিন্তা করছে যে আহমদীদেরকে নির্মূল করো আর এটির উপরেই তারা জোর দেয়। কেননা এরাই রসূল অবমাননার জন্য দায়ী আহমদীদেরকে শেষ করো। এই নির্বোধরা জানে না যে, আহমদীরা যে ত্যাগ স্বীকার করছে তারা তো মহানবী (সা.)-এর বার্তাকে প্রচার করার জন্য ইসলামের প্রচারের জন্য করছে। তিনি সত্যিকার জিহাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, কাসরে সালীবের অর্থ হচ্ছে জিহাদের পদ্ধতি বা রক্ত প্রবাহিত করা নয়। যাহোক, এটি হল বর্তমান যুগের আলেম-ওলামাদের দৃষ্টিভঙ্গি, কেননা তারা সব ধরনের লড়াই ও জিহাদকে শেষ করে বসেছে। আর আমি এর চরম বিরোধী, কেননা মসীহ্ এসে কোন যুদ্ধ করবে না। তবে হ্যাঁ যদি মুসলমানদের ওপর বা বিভিন্ন দেশের ওপর আক্রমণ হয় সেখানে প্রতিহত করা উচিত এবং বৈধও বটে। কিন্তু ধর্মের নামে কি কোন আক্রমণ হচ্ছে? ধর্মের নামে কোন আক্রমণ হচ্ছে না। বিভিন্ন রীতি বা পদ্ধতি যা শত্রুরা অবলম্বন করছে সেই পদ্ধতিতে আক্রমণ করা হচ্ছে। ইসলামের যারা চরম বিরোধী বা ঘোর বিরোধী তারাও সাবধানতার সাথে এ কথাই বলে যে, আমরা ইসলামের ওপর আক্রমণ করছি না। বরং এইসব লোকের ওপর আক্রমণ করছি যারা অপকর্ম করে। অতএব এই দাজ্জালি ফিতনার মোকাবিলা করার জন্য ইসলামের সুন্দর শিক্ষামালাকে বিশ্ববাসীর সামনে প্রচার করতে হবে। আর বিশ্ববাসীকে বলতে হবে যে, এই লোকেরা দাজ্জালি ফিতনা ছড়াচ্ছে তাই চিন্তা করে দেখো এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কর। আর এটি সেই পদ্ধতি যেগুলো আমরা অবলম্বন করতে পারি। অস্ত্রের মাধ্যমে আমরা কতদিন যুদ্ধ করতে থাকব? যেভাবে আমি বলেছি, যদি কোন দেশের ওপর আক্রমণ করা হয় তাহলে তা প্রতিহত করা উচিত এবং প্রস্তুত থাকা উচিত, কিন্তু সেটির জন্য তারা প্রস্তুত নয়। তিনি বলেছেন, দ্বিতীয় দলিল বিভিন্ন হাদীস এবং অলি-আউলিয়াদের বিভিন্ন কাশফ ও দিব্যদর্শন এই কথার প্রমাণ করে যে, মসীহ্ মাওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী ১৪ শতাব্দীর শিরোভাগে আসবেন। হাদীস "আল আয়াতু বাআদাল মিয়াতাঈন" এর পূর্বের ও পরের অনেক আলেমগণ এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, মিয়াতাঈন শব্দ দ্বারা সেই মিয়াতাঈন বুঝানো হয়েছে সেই দুইশত বুঝানো হয়েছে যা এক হাজারের পর আসবে। এদিক থেকে এই হাদীসের অর্থ হল মাহদী ও মসীহ্র জন্ম যা একটি বড়ো নিদর্শন যা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হবে। আর চতুর্দশ শতাব্দীতে তার আবির্ভাব হবে আর বুদ্ধিমান আলেমরা এই অর্থই করেছেন। এই লক্ষণ থেকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে প্রতিশ্রুত মাহদী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করা আবশ্যক যেন চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি আবির্ভূত হন, এছাড়াও অনেক

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

মহান আল্লাহ্র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

লক্ষণাবলির ভিত্তিতে নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব তার পুস্তক হিজাজুল কেরামাতে লেখেন যে, আমি শক্তিশালী লক্ষণাবলির ভিত্তিতে মনে করি চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে প্রতিশ্রুত মাহদী আসবেন। আর সেই লক্ষণাবলির একটা হল চতুর্দশ শতাব্দীতে অনেক দাজ্জালি ফিতনা মাথা চাড়া দেবে। তাই দেখো, এই প্রসিদ্ধ মৌলবি যিনি অনেক কিতাবের প্রণেতা কত পরিষ্কারভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের যুগ। আর এখানে কথা শেষ নয় বরং, তিনি তার পুস্তকে তার সন্তানদের নসিহত ও ওসিয়্যত করে গেছেন যে, আমি যদি মসীহ্ মাওউদের যুগ না পাই তাহলে তোমরা আমার পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর সালাম মাহদীকে পৌঁছাবে, কিন্তু একইসাথে তিনি এটিও লিখেছেন যে জীবিত থাকলে হতে তিনিও মসীহ্ মাওউদের বিরোধিতা করতেন মৌলবিদের মতো অর্থাৎ সিদ্দীক সাহেব। এসব মৌলবি চতুর্দশ শতাব্দীতে আসা নিয়ে কখনও কি ভাবে না? তারা কি তাকওয়া অবলম্বন করছে, খোদাকে ভয় করছে, কোন হামলা তারা করে নি? তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, গালি দেওয়া কোনটি বাকি আছে যা তারা করে নি? আসল কথা হল, কোন হৃদয়কে যতক্ষণ আল্লাহ তা'লা উন্মুক্ত করে না দেন ততক্ষণ হৃদয় খুলতে পারে না। যতক্ষণ সেই সর্বশক্তিমান খোদা নিজের পক্ষ থেকে অন্তঃদৃষ্টি দান না করেন ততক্ষণ কোন চোখের জন্য দেখা সম্ভব নয়।

দারকুতনির একটি হাদীসের বরাতে তিনি বলেছেন যে, এটি ঐ কথার প্রমাণ বহন করে, প্রতিশ্রুত মাহদী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আসবেন। 'ইন্না লেমাহদিয়্যিনা আয়াতাঈনে' হাদীসের অর্থ হল, আমাদের মাহদীর দুইটি লক্ষণ রয়েছে যখন থেকে আকাশ ও পৃথিবীর ভিত রচনা করা হয়েছে সেই লক্ষণ কোন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ বা নবীর জন্য প্রকাশিত হয় নি। সেই নিদর্শন হল চাঁদের নির্ধারিত তারিখগুলোর প্রথম রাতে এবং সূর্যের নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিনে রমযান মাসে গ্রহণ লাগবে। অর্থাৎ এই দিনগুলোতে যখন মাহদী পৃথিবীতে দাবি নিয়ে দণ্ডায়মান থাকবেন আর পৃথিবী তাকে গ্রহণ করবে না। আকাশে তার সত্যায়নের জন্য একটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে। এই নিদর্শন হল নির্ধারিত তারিখে যেভাবে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রমযান মাসে চন্দ্র এবং সূর্যের গ্রহণ হবে। আর অন্ধকারের অর্থ হল, আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা এটি যে, পৃথিবীতে জুলুম করা হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তার আগমনের সময় চতুর্দশ শতাব্দী ধরা হয়েছে কেননা চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ থেকে এটি বোঝা যায়। তাই এর চেয়ে বেশি পরিষ্কার এবং স্পষ্ট প্রমাণ আর কী হতে পারে যে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের যুগকে হাদীসে মাহদীর আগমনের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আর আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে চতুর্দশ শতাব্দীতে যিনি মাহদী হবার দাবি করেছেন তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করা হয়েছে। অতএব এ সকল লক্ষণ থেকে এটি সুনিশ্চিত যে প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগ হল চতুর্দশ শতাব্দী। এটিকে অস্বীকার করা পরীক্ষিত বিষয়কে অস্বীকার করার নামান্তর। যা প্রকাশ্য বা স্পষ্ট। তিনি আরো এক জায়গায় বলেন, তেরোশো বছরে অনেকেই মাহদী হবার দাবি করেছে, কিন্তু এই স্বগীয় নিদর্শন কারও জন্য প্রকাশিত হয় নি। এরপরও তারা বলে যে, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। পূর্বে যারা দাবি করেছিল তাদের জন্য কেন এই নিদর্শন প্রকাশ পায় নি। আমার জন্যই এটি প্রকাশিত হয়েছে অথচ তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছ। এটি তো আকাশ থেকে প্রকাশিত নিদর্শন। যারা মাহদী হবার দাবি করেছে তারা কোন বাহানায় রমযান মাসে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ ঘটাতে পারত যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও শক্তি থাকত আর রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ঘটাতে পারত। খোদার কসম যার হাতে আমার প্রাণ তিনি আকাশ থেকে আমার সমর্থনে সেই নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। আর তখনই প্রকাশ করেছেন যখন মৌলবিরা আমার নাম দাজ্জাল রেখেছে। মিথ্যাবাদী রেখেছে, কাফের রেখেছে বরং অনেক বড়ো কাফের আমাকে আখ্যায়িত করেছে। এটি সেই নিদর্শন যা আজ থেকে ২০ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, এদেরকে বলো আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য আছে এটিকে তোমরা কি গ্রহণ করবে নাকি করবে না। পুনরায় তাদেরকে বলো আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য আছে তোমরা কি এটিকে গ্রহণ করবে? স্মরণ রাখা উচিত যে, আমার সত্যায়নের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছে। শতাধিক এমন অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা পূর্ণ হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ যার সাক্ষী, কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আদম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কারও পক্ষে প্রকাশিত হয় নি। আমি খানা কাবায় দাঁড়িয়ে কসম খেয়ে বলতে পারি এই নিদর্শন আমার সত্যায়নের জন্য। এমন কোন ব্যক্তির সত্যায়নের জন্য নয় যাকে এখনও মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হয় নি। একইভাবে আমি খানা কাবায় দাঁড়িয়ে শপথ করে বলতে পারি এই নিদর্শন এর মাধ্যমে শতাব্দী চিহ্নিত হয়। কেননা এই নিদর্শন চতুর্দশ শতাব্দীর এক ব্যক্তির সত্যায়নের জন্য প্রকাশিত হল। তাই নির্ধারিত হল যে, মহানবী (সা.) মাহদীর আবির্ভাব এর যুগ চতুর্দশ শতাব্দীকে আখ্যা দিয়েছেন। কেননা চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হয়েছে। সেই শতাব্দি মাহদীর যুগ হিসেবে মানতে হবে। কেননা দাবি এবং প্রমাণের মাঝে দূরত্ব ও পার্থক্য যেন না থাকে। তিনি (আ.) বলেন, ইসলামের আলেমদের এই বিশ্বাস ছিল যে, ইমাম মাহদী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হবেন তিনি তার পুস্তক তোহফায়ে গোলড়াবিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণীতে লিখেছেন যে, এরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তার সত্ত্বেও লোকেরা মসীহ্ মাওউদ-কে মানার জন্য প্রস্তুত নয়। তার প্রয়োজনের জন্য যুগ স্বয়ং ঘোষণা দিয়ে বলেছেন যে, হে খোদার বান্দাগণ! আপনারা জানেন যখন অনাবৃষ্টি হয় তখন কূপের পানিও শুকিয়ে যায় তখন আকাশের পানি পৃথিবীতে এক ধরনের সতেজতার সৃষ্টি করে তখন ঐশী বাণী অর্থাৎ খোদার ওহী শুকিয়ে যাওয়া বিবেকবুদ্ধিকে সতেজ করে। অতএব এই যুগই আধ্যাত্মিক পানির মুখাপেক্ষী ছিল। আমি আমার দাবি সম্পর্কে এতটুকু বলা মনে করি যে, আমি একান্ত প্রয়োজনের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। বর্তমান যুগে মুসলমানদের অবস্থা যেটি আমি পূর্বে বলেছি। তাদের অবস্থা কি একজন সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে না? বরং এরা নিজেরাই বলছে বার বার যে একজন সংস্কারক আসা উচিত যিনি ইসলামের নিমজ্জমান নৌকাকে নিরাপদে তীরে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী যার সম্পর্কে পূর্ণ হচ্ছে তাকে মানার জন্য তারা প্রস্তুত নয়। তিনি আরো বলেন যে এমন মানুষ ও আধ্যাত্মিক পানি চায়। পৃথিবী মরে গেছে, যুগ 'যাহারাল ফাসাদু ফিল বারির ওয়াল বাহার'-এর পরিপূরক স্থল হয়ে গেছে। জলে স্থলে নৈরাজ্য ও অন্ধকার ছেয়ে গেছে স্বার্থপরতা বেড়ে গেছে আর আজ আমরা এটি দেখছি। এটি কি এদের চোখে পড়ে না? আর এরপরও মানুষ বলে যে, মাহদীর যুগ এখনও আসে নি। তিনি বলেছেন, যুগ তো যাহারাল ফাসাদু ফিল বারির ওয়াল বাহার-এর লক্ষণাবলির পরিপূরকস্থল হয়ে গেছে। বাহার বলতে আহলে কিতাবদেরকে বুঝায়। বস্তুত মানুষের সকল শ্রেণির মাঝে এক ধরনের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

যেভাবেই দেখো না কেন পৃথিবীর অবস্থা বদলে গেছে আধ্যাত্মিকতার আর বাকি নাই। আধ্যাত্মিকতার প্রভাব আর দেখা যায় না। নৈতিক ও কর্মগত দুর্বলতায় সবাই প্রভাবিত আল্লাহকে চেনার লক্ষণই দেখা যায় না। তাই এখন স্বগীয় বা উর্ধ্বলোকের পানির প্রয়োজন। নবুওয়্যতের জ্যোতি অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন যা সোচ্চার হৃদয়কে আলোকিত করবে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যেতে পারে তিনি নিজ অনুগ্রহে এই ধরনের জ্যোতি ও নূর অবতীর্ণ করেছেন, কিন্তু খুবই কম মানুষ এই নূর বা জ্যোতি থেকে লাভবান হচ্ছে বা কাজে লাগাচ্ছে। এরা বলে থাকে ঈসা আকাশ থেকে আসবে এটি যদি সত্য হয় তাহলে এখনই তার নাযিল হবার কথা আর হওয়া উচিত যদি নাযিল হতে হয়, কেননা তোমাদের ধারণা অনুসারে একজন প্রতারক মিথ্যাবাদী মসীহ্ মাওউদ হবার দাবি করেছে। সত্যিই যদি এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে আর যদি এটি সত্যি হয় যে মসীহ্ আকাশ থেকে নাযিল হবেন তাহলে এখনি তাকে পাঠানো উচিত। যাতে মানুষ পথভ্রষ্ট না হয়। কেননা একটি বড়ো জামা'ত আমাকে মসীহ্ মাওউদ হিসেবে মেনে নিয়েছে। যদি এখনই আকাশ থেকে নেমে না আসে, তাহলে কখন আসবে? এটি কি হতে পারে যে আল্লাহ তা'লা মিথ্যাবাদী এবং প্রতারকদের সাহায্য করবেন। যদি কোন সময় এমনটি হয়ে থাকে তাহলে তা দৃষ্টান্ত দেখাও। তোমরা বলো সত্যবাদীদের সত্যের মাপকাঠি কি? বিরোধীদের চিন্তা করা উচিত। ইসলামের ভিতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য নাকি নাউযুবিল্লাহ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মান্যকারীরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে এটা তোমাদের কথা নাউযুবিল্লাহ। প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই জামা'তভুক্ত হচ্ছে। আর ইসলামের সুরক্ষার জন্য আল্লাহ তা'লা কাউকে পাঠাচ্ছেন না। নামসর্বস্ব আলেমদের সব চেষ্টা বৃথা যাচ্ছে বরং এরা ইসলামকে দুর্নাম করছে নিজেদের অপকর্মের মাধ্যমে। তথাকথিত নামসর্বস্ব আলেম যারা ইসলামের প্রতিরক্ষা করছে আহমদীদের নির্মূল করার কাজ করে। তাদের এই অপচেষ্টা ইসলামের সুন্দর চেহারা কলুষিত হচ্ছে। আর তাদের অনেকেই এই কথা স্বীকার করে আর মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণি এটি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, আলেমরা যে-সমস্ত কথা বলে বা যে ধরনের কাজ করে এর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা স্পষ্ট হয় না বরং এরা ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে কলুষিত করছে। এদের কিছু বিবেক খাটানো উচিত। মানা বা না মানা ভিন্ন কথা। কিন্তু কোথাও এই অধিকার নেই যে সে বলবে সে কাউকে গালি দিবে বা লোকদেরকে গালি দিতে বাধ্য করবে নতুবা হত্যা করা হবে যে তোমরা মুসলমান নও। পাকিস্তানে এই কাজই করছে। পবিত্র কুরআনে হযরত মুসা (আ)-কে ফেরাউনের মোকাবিলায় বলা হয়েছিল যে নরম ভাষা ব্যবহার করতে। কিন্তু পাকিস্তানে এরা তো গালিগালাজ করতে উদ্যত, গালি ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই নেই। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তাদের গালিগালাজের মোকাবিলা করতে পারব না। এক্ষেত্রে তারা জিতে গেছে। কিন্তু এখানে আমি এর পাশাপাশি আহমদীদেরকে বলে দিচ্ছি যে, তবলীগ করার সময় অনেক ক্ষেত্রে উত্তেজনার বসে ভুল কথা বলে বসে। কোন আহমদীর এটি কাজ নয় এমন ভাষা বিরুদ্ধবাদীদের জন্য ব্যবহার করা। তারা যে ভাষা ব্যবহার করে

এমন ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রেম প্রীতি ভালবাসা এবং ইসলামের সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কিত কথা আমাদের উপস্থাপন করা উচিত।

তিনি (আ) বলেন, স্মরণ রেখো! আমার আগমনের দুটি উদ্দেশ্য এক এখন ইসলামের জন্য যে বিজয় নিহিত সেই আনুগত্য ও ইসলাম হারিয়ে ফেলছে বা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ইসলাম অনাথ শিশুর মতো হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি বাতিল ধর্মের আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করি সত্যতা প্রকাশ করি। আর সেই প্রমাণ জ্ঞানগত দলিল ছাড়া নূর ও আশিস এবং কুরআনের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে তাছাড়া এটি সম্ভব নয়। এখন তোমরা বলছ যে, যুগ মাহদীকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে না, কিন্তু যুগের অবস্থা, ইসলামের অবস্থা, শত্রুর অবস্থা দেখে যুগ মসীহ্‌কে হাতছানি দিয়ে ডাকছে যে, এমন অবস্থায় কারও আসা আবশ্যক ছিল। ইসলামের যেন জয়জয়কার হয় আর এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন। আর আমি নিশ্চিতরূপে বলছি, ইসলামের বিজয় হয়েই ছাড়বে আর এর প্রভাব প্রকাশ পেয়ে গেছে। একথা সত্য যে, এই বিজয়ের জন্য তরবারি বা কোন বন্দুকের প্রয়োজন নেই। আর খোদা তা'লা আমাকে অস্ত্রসহ প্রেরণ করে নি। যে ব্যক্তি এটি মনে করবে সে ইসলামের একজন দুর্ভাগা বন্ধু। ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে হৃদয় জয় করা। আর এই উদ্দেশ্য তরবারি দ্বারা কখনও অর্জিত হতে পারে না। মহানবী (সা.) তরবারি ধারণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমি অনেকবার এটি বলেছি, সেই তরবারি শুধুমাত্র ইসলামের নিরাপত্তার জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য ধরেছিলেন। আর তখন ধরেছিলেন যখন বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আমার আগমনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য ধর্মের ওপরে যেন ইসলামের জয় জয়কার হয়। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, মানুষ বলে আমরা নামায পড়ি, এটি করি, ওটি করি, এগুলো কেবল বুলিসর্বস্ব। এজন্য অবশ্যক হচ্ছে সেই অবস্থা মানুষের মাঝে সৃষ্টি করা যা ইসলামের মূল এবং আসল। আমি এটিও জানি কোন ব্যক্তি মু'মিন মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না আবু বকর, উমর, ওসমান, আলী রিযওয়ানুল্লাহ আলাইহিম-এর মতো গুণ তাদের মাঝে সৃষ্টি না হবে। আর তারা জগৎকে ভাল ভালবাসত না। তারা নিজেদের জীবন খোদা তা'লার পথে উৎসর্গ করে রেখেছিল। তাদের সবকিছুই খোদার ধর্মের জন্য ছিল। আর বর্তমানে এরা সবাই দুনিয়ার মোহে ডুবে গেছে। খোদার জন্য তাদের কোন চিন্তাই নাই। সাধারণভাবে মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে দেখুন তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে দুনিয়ার জন্য, বিল্ডিং বানালে দুনিয়ার জন্য আর নামায-রোযা যদি করে তাও দুনিয়ার জন্য জগতের মানুষের নৈকট্য পাবার জন্য সবকিছু। ধর্মের জন্য কোন খেয়াল নাই। সবাই এটি দেখছে আর এটিই সত্য আর সবাই এটি বুঝতে পারে। তাই ইসলামের আবির্ভাব এর উদ্দেশ্য কি কেবল এটুকুই ছিল নাকি কোন মহান উদ্দেশ্য ছিল? আমি জানি মোমেনদেরকে পবিত্র করা হয় এবং তাদের মাঝে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় এবং খোদার যত সে কাছে আসে সে খোদার কথা শুনে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আশ্বস্ত হয় যে, তোমাদের সবাই মর্যাদা অর্জন করেছে এবং সে মুসলমান হোক বা আহমদী। আহমদীদের বেশিরভাগ এটা নিয়ে ভাবা উচিত এবং চিন্তা করা উচিত যে খোদার নৈকট্য আমরা লাভ করেছি কিনা।

হুযূর (আই.) বলেন, এই সম্পর্কে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা বলব সেই সব ভবিষ্যদ্‌বাণীর অন্তর্ভুক্ত যা কুরআনে আছে যা পূর্বে উল্লেখ করেছি যা মসীহ্ মাওউদ হবার প্রমাণ। সেগুলো বড়ো একটি নিদর্শন হল মসীহ্ মাওউদের জন্য অবশ্যক সে যুগে জন্মগ্রহণ করা যে যুগে হাদীসে উল্লেখ আছে, শেষ যুগে যখন নৈরাজ্য অধিক হবে, যুগের যখন অবসান ঘটবে তখন একজন আমীর তথা মসীহ্ মাওউদ আবির্ভূত হবেন। আর এটি যে শেষ যুগ একথার প্রমাণের জন্য দুই ধরনের প্রমাণ আছে কুরআনের উল্লিখিত লক্ষণাবলি হাদীসে উল্লিখিত লক্ষণাবলি যা কেয়ামত নিকটবর্তী হবার প্রমাণ বহন করে। যেমন একই মাসে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হওয়া। এর ব্যাখ্যা আয়াত 'জুমিআস শামসু ওয়াল কামারু'-এর মাধ্যমে হয়। আর চন্দ-সূর্য উভয়টিকে সমবেত করা হবে তাই এই আয়াতে ও এর ব্যাখ্যা রয়েছে। চন্দ-সূর্য গ্রহণের কথা আমি পূর্বেই বলেছি এরপর তিনি বলেন তারকা বা নক্ষত্র পতিত হওয়া, ঝরে যাওয়া, 'ওয়া ইযাল কাওয়াকেবুন তাসারাত' থেকে এটি বুঝা যায় অর্থাৎ হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা কমে যাবে। নামধারী আলেম যারা ধর্মকে বিকৃত করে তাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। আজকাল আমরা এটিই দেখছি আর এই সমস্ত নক্ষত্রের আলো হারিয়ে গেছে আর সর্বত্র শুধু নামধারী আলেমদের দেখা যায়। এরপর তিনি (আ.) বলেন, এটিও লেখা আছে যে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ হবে যার ফলে অন্ধকার ছেয়ে যাবে আর 'ইযাশ শামসু কুভ্যিরাত' থেকে এটি প্রকাশ পায় এর অর্থ হল সূর্যের আলোকে ঢেকে দেওয়া হবে সাময়িক দুর্বলতার দিকে ইশারা যা মুসলমানদের মাঝে পরিদৃশ্য হবার কথা। মহানবী (সা) সেই সূর্য যার আলো পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছিল তাঁর শিক্ষার ওপর পর্দা টেনে দেওয়া হবে আর মাহাত্ম্য হৃদয় থেকে হারিয়ে যাবে বা কমে যাবে। তখন আল্লাহ তা'লা রহমত প্রকাশিত হবে মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার দাসের মাধ্যমে তার মাহাত্ম্য ও প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সামনে প্রকাশ করা হবে। কুরআন নিয়ে চিন্তা করলে কেবল এটি বোঝা যাবে বা বাহ্যিকভাবে কুরআন পড়লে হবে না। যারা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের সম্মান প্রকাশ পাবে আয়াত 'ওয়া ইযাল উহুশ্ব হুশিরাত'-এ এই দিকেই ইশারা করা হয়েছে। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে এরা অজ্ঞ এবং বন্য অর্থাৎ বন্যপ্রাণী একত্র করা এর একটি অর্থ আর একটি অর্থ হল যারা বন্য প্রকৃতির মানুষ তারা পরিষ্কারভাবে সামনে আসবে। এরা ব্যাহত দাবি করবে যে তারা সুশিক্ষিত কিন্তু আসলে এরা বন্য। এদের আচার-আচরণ কি বন্য নয়? তারা নিজেদের অনেক উঁচু-বড়ো মনে করে, সভ্য মনে করে। এমন সময় আল্লাহর এক ঐশী পুরুষের প্রয়োজন রয়েছে। যিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এটি সেই যুগ যখন বন্যরা জ্ঞান বুদ্ধি বিবেকের নামে সমবেত হচ্ছে এবং বন্য আচার আচরণ প্রদর্শন করছে আর পরস্পরের ধ্বংসের কারণ হচ্ছে এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কি হবে যা আমাদের সামনে এখন প্রকাশ পাচ্ছে সত্য মাহদীর। তিনি আরো বলেন বইপুস্তক পত্র পত্রিকা সাময়িকী চিঠি পত্র ছাপা এটিও একটি লক্ষণ। 'ওয়া ইযাস সুহুফু নুশিরাত' আয়াত থেকে এটি স্পষ্ট হয়। যখন বইপুস্তকের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হবে এবং প্রচার প্রসারের উপকরণ অনেক বেড়ে যাবে। আর মসীহ্ মাওউদের যুগে এগুলো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই মাধ্যমগুলো পাপ প্রসারের কাজে ব্যবহার হবে। আর এটিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য মসীহ্ মাওউদ আসবেন। এ সমস্ত আবিষ্কার থেকে মসীহ্ মাওউদ-এর জামা'ত উপকৃত হচ্ছে এবং পুণ্যেরও প্রচার হচ্ছে। তাই এ যুগে একজন সংস্কারক এর প্রয়োজন ছিল তিনি এসেছেন আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু যদি চিন্তা করেন আর আলেমগণ যদি চিন্তা করত তাহলে বুঝত এগুলো হল আলেমদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যারা ইসলামের নক্ষত্র। সেই নক্ষত্র ঘোলাটে হয়ে যাওয়ার বা ঝাপসা হয়ে যাবার কথা বর্ণিত আছে 'ওয়া ইযান নুজুমুন কাদারাত' থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় অর্থাৎ যখন নক্ষত্র ঝাপসা হয়ে যাবে। সাহাবীদের আদর্শ লোপ পাবে পুণ্যবানদের উত্তম আদর্শের কোন গুরুত্ব থাকবে না। নামধারী আলেমদের আচার-আচরণ ঝাপসা হবে তারা ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরতে সক্ষম হবে না। এসব কিছুই আমরা এখন দেখছি। তাদের প্রভাব দূর করার জন্য এবং ইসলামের উজ্জ্বলতা তুলে ধরার জন্য কোন সংস্কারকের কি প্রয়োজন ছিল না? বেদাত পথভ্রষ্টতা সকল ধরনের পাপাচার অনাচার এর প্রসার ঘটবে এই যুগে যেমনটি এই আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া ইযাস সামাউন শাক্কাত' এই দিকে ইশারা করা হয়েছে অর্থাৎ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। স্বর্গীয় নিদর্শন প্রকাশিত হবে। সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ পুচ্ছবিশিষ্ট নক্ষত্র এ সবই তার যুগে প্রকাশিত হবে। আর তাঁর (আ.) দাবির পরে প্রকাশিত হয়েছে। এই অনাচার পাপাচার প্রসারের কারণে আল্লাহ তা'লার প্রকৃত কুদরত ও প্রকাশ পাচ্ছে বিপদ আপদ প্রকাশ পাচ্ছে এসব লক্ষণ কেয়ামত নিকটবর্তী এরই প্রমাণ বহন করে। পৃথিবীতে এক অসাধারণ বিপ্লব সাধিত হয়েছে। স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর যুগ কেয়ামতে নিকটবর্তী হওয়ার যুগ। আয়াত 'ইকতারাবাতিস সাআতি ওয়ান শাক্কাল কামারু' দ্বারা স্পষ্ট যে এই যুগটি মহানবী (সা.)-এর যুগ। কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার যুগ। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, এরপর আরো ১৩০০ বছর কেটে গেছে। তাই এ যুগ যে সে যুগ সে সম্পর্কে কারও সন্দেহ থাকতে পারে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। তাই এই যুগের সংশোধনের জন্য কারও আসা আবশ্যক ছিল। যুগের প্রয়োজন এটি আর ঐশী সমর্থন ও প্রকাশ পাচ্ছে যা আমরা দেখছি। এ কারণেই আমি আয়াত 'ওয়া আম্মা বিনি'মাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস'-এর ভিত্তিতে নিজ সম্পর্কে বলব যে আল্লাহ তা'লা আমাকে সেই সব নেয়ামত দান করেছেন যা আমার নিজ প্রচেষ্টার ফসল নয় বরং মাতৃগর্ভে আমাকে তা দেওয়া হয়েছে। আর আমার স্বপক্ষে তিনি সেই সব নিদর্শন প্রকাশ করেছেন যেগুলো অগণিত। কোন কোন নিদর্শনের প্রকৃতি হল আল্লাহ তা'লা তাকে সকল বিরোধীর বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি অনুসারে শত্রুর অনিষ্ট থেকে আমার রক্ষা করেছেন। কিছু নিদর্শন হল এমন যে-সব জায়গায় প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমার চাহিদা বা অভাব মোচন করেছেন। আর কিছু কিছু নিদর্শনের প্রকৃতি হল তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি 'ইন্নি মুহিনুন মান আরাদা ইহানাতাকা' অনুসারে আমার ওপর আক্রমণকারীকে লাঞ্ছিত করেছেন আর এই সংক্রান্ত অনেক নিদর্শন আজও দেখি বিভিন্ন রিপোর্টে আসে তাতে এগুলোর উল্লেখ থাকে, অনেকে মানুক বা না মানুক এগুলো থেকে শিক্ষা নেয়। আর কিছু নিদর্শন এমন রয়েছে আমার পক্ষে যেমন যারা আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে সেসব মামলায়

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday,16 Oct 2025 Issue No.42

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বিজয় দান করেছেন। যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এত দীর্ঘ বয়স কোন মিথ্যাবাদী লাভ করে নি, আল্লাহ তা'লা আমাকে দীর্ঘ জীবন দান করেছেন। কিছু নিদর্শন যুগের অবস্থা দেখে বুঝা যায় অর্থাৎ যুগ কোন সংস্কারকের জন্মের কথা তুলে ধরে। কিছু নির্দেশন এমন যে বন্ধুদের পক্ষে আমার দোয়া গৃহীত হয়েছে। কিছু নিদর্শন এমন আছে যে দুষ্কৃতকারী শত্রুর বিরুদ্ধে আমার দোয়া গৃহীত হয়েছে। আর এমন কিছু নির্দশন আছে যে অনেক জটিল রোগী আমার দোয়ায় আরোগ্য লাভ করছে। আর কিছু নিদর্শন এমন যা আমার সত্যায়নের জন্য খোদা তা'লা উর্ধ্বলোকে এবং জমিনে দেখিয়েছেন। আর কিছু নিদর্শন এমন যা আমার সত্যায়নের জন্য বড়ো বড়ো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং মহানবী (সা.)-কেউ তারা স্বপ্নে দেখেছেন, যেমন- সিন্ধের সাজ্জাদা নাশীন এবং খাজা গোলাম ফরিদ সাহেব চাচড়া শরীফ। কোন কোন নিদর্শন এমন ছিল যে হাজার হাজার মানুষ শুধুমাত্র এই কারণে আমার বয়আত করেছে স্বপ্নে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, ইনি সত্য এবং খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত। এভাবে নিদর্শন আজও আমরা পূর্ণ হতেই দেখছি। গতকালও আমি কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছিলাম আর এ ধরনের অগণিত ঘটনার রিপোর্ট রয়েছে। আল্লাহ তা'লা স্বপ্নে বলেছেন, ইনি সত্য মাহদী, তাকে গ্রহণ করো। কেউ কেউ এই কারণে বয়আত করেছেন যে মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে তারা দেখেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীর শেষ হওয়ার দ্বার প্রান্তে তিনি খোদার শেষ খলীফা এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্। আর কতক নিদর্শন এমন যে, বড়ো বড়ো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আমার আবির্ভাবের পূর্বেই আমার নাম মসীহ্ মাওউদ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন- নিয়ামতুল্লাহ অলি এবং লুধিয়ানার মিয়া গোলাপ শাহ। আর কোন নিদর্শন এমন- যা প্রত্যেক জাতির মোকাবিলায় এবং প্রত্যেক যুগে আল্লাহ তা'লা দেখিয়েছেন আর কোন যুগে মুবাহেলা করা হয়েছে এবং বর্তমানে পুরো বিশ্বও দেখছে যে, এই সাহায্য এবং সমর্থন আজও দেখা যাচ্ছে। আর সারা বিশ্ব হাজার হাজার মানুষ তার হাতে বয়আত করছে এটি কি খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের নিদর্শন নয়? হায়! এই সকল লোকেরা যদি কিছুটা বিবেকবুদ্ধি খাটাতো।

অতএব এসব বিষয় তোমাদের চিন্তাভাবনার জন্য যাদেরকে আল্লাহ তা'লা বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন। যদি তাদের চোখে পর্দা আবৃত না হয় আর ন্যায় নীতির দাবির ভিত্তিতে তারা যদি যাচাই-বাছাই করে তাহলে তাদের মানতে হবে যে যুগের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত সময় মসীহ্ এবং মাহদীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে খোদার পক্ষ থেকে এসেছেন। আর বিগত ১৩৬ বছর ধরে আহমদী জামা'তের ইতিহাস এই কথার সাক্ষী। নিশ্চয় খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থন তার সঙ্গে আছে এবং তার জামা'তের সঙ্গে আছে। আজ বিশ্বের সকল প্রান্তে, প্রত্যেক দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠা, ইসলামের তবলীগের কাজ এবং লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যেভাবে গতকাল আমি রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলাম। খোদার পক্ষ থেকে লোকদের পথনির্দেশনা পবিত্র কুরআনের প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'লার ফযল বা অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভব নয়। এখন বিরুদ্ধবাদীরা হাজার চেষ্টা করলেও এই ধারা যা আল্লাহ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে দ্রুত প্রচার ও প্রসার পেতে থাকবে। এর পাশাপাশি আমাদের ওপরও অনেক বড়ো দায়িত্ব বর্তায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ-কে মানা এবং শুধু নারা বা জয়ধ্বনি দিয়ে আমরা এই উদ্দেশ্যে অর্জন করতে পারব না। আমাদেরকেও আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালিত করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে। যখন আমরা নিজেদের মাঝে সত্যিকার বিপ্লব সৃষ্টি করব তখনই আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যিকারের সাহায্যকারী হতে পারব। আর সত্যিকার সাহায্যকারী হয়ে বিশ্ববাসীকে ইসলামের ক্রোড়ে আনতে পারব এবং খোদার একত্ববাদ বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। আর বিশ্ববাসীকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে একত্র করতে পারব। আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে এর সামর্থ্য দান করুন, আমীন।

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" **(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)**

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)**

(১ম পাতার শেষাংশ...)

দুর্বল বিশ্বাস, কারণ সে নবী করীম (সা.)-এর পবিত্রতা সম্পর্কে সংশয় পোষণ করেছিল। এমন একজন ব্যক্তির বিশ্বাস রক্ষার জন্য এক মহীয়সী স্ত্রীর পর্দা তোলা আপনার মতে বড় কিছুকে ছোট কিছুর জন্য ত্যাগ করার সমান।"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ,ঠিক তাই ভেবেছিলাম।"

আমি বললাম, "তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে ছোট কিছুকে বড় কিছুর জন্য ত্যাগ করা উচিত। এবার এই নীতির ভিত্তিতে ঐ ঘটনাটি পর্যালোচনা করা যাক। এই ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির ঈমান রক্ষা করা ছিল বড় উদ্দেশ্য, আর অল্পক্ষণের জন্য পর্দা তোলা ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট ব্যপার।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কীভাবে?"

আমি বললাম, "আপনি জানেন যে পর্দার বিধান পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতে ছিল না এবং এটি নবী করীম (সা.)-এর জীবনের শেষ দিকে নাযেল হয়েছিল। মক্কার তের বছর নবুয়তের সময় কোন এমন আদেশ ছিল না; এমনকি মদিনায় হিজরতের পরও চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত এটি নাযিল হয় নি। অর্থাৎ নবী করীম (সা.)-এর তেইশ বছরের নবুওয়তের জীবনের প্রায় সতেরো আঠারো বছর পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীগণ পর্দাহীন অবস্থায় ছিলেন। ফলে যখন পর্দার বিধান নাযিল হলো, তখন প্রায় প্রত্যেক সাহাবি নবী করীম (সা.)-এর স্ত্রীদের আগে থেকেই দেখেছিলেন।

এখন ভাবুন, যাঁকে একজন ব্যক্তি আগে বহুবার দেখেছে-সম্ভবত তাঁর যৌবনে- যদি কোন এক বিশেষ মুহূর্তে নবী করীম (সা.) সেই স্ত্রীর মুখমণ্ডল সাময়িকভাবে উন্মোচন করেন সেই ব্যক্তির ঈমান রক্ষার জন্য, তাকে কী ক্ষতি হল? তিনি তো আগেই তাঁকে যৌবনে দেখেছিলেন, আর তখন তিনি ছিলেন বৃদ্ধা। সুতরাং নবী করীম (সা.) যদি দুর্বল ঈমানের অধিকারী এক ব্যক্তির বিশ্বাস রক্ষার জন্য সাময়িকভাবে তাঁর এক স্ত্রীর মুখ থেকে পর্দা সরিয়ে দেন, তবে সেটি বড় কিছুকে ছোট কিছুর জন্য ত্যাগ করা নয়; বরং ছোট কিছুকে বড় কিছুর জন্য ত্যাগ করা।"

এই ব্যাখ্যা শুনে সে তৃপ্ত হল এবং বলল, "এখন আমার সমস্ত সংশয় দূর হয়েছে।"

এখন ভেবে দেখুন, কত বড় পরিবর্তন এটি! একময় বলা হত, ইসলাম মিথ্যা ধর্ম,কারণ এটি পর্দার আদেশ দিয়েছে; আর এখন বলা হচ্ছে, নবী করীম (সা.) কেন কারো ঈমান রক্ষার জন্য এক মুহূর্তের জন্যও পর্দা তুললেন।

ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা লেখকদের একজন, ডেসমন্ড শ, যিনি অন্তত নিজের ধারণায় এইচ.জি, ওয়েলসের চেয়ে বড় মনে করতেন নিজেকে, একদিন আমাকে বললেন, "বিশ্বে সবচেয়ে বড় অবিচার হল এই যে , যিনি মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক শান্তি এনে দিয়েছিলেন, সেই নবীকেই যুদ্ধবাজ বলা হয়, এবং খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে।" এরপর তিনি বললেন, "আপনি হয়তো আমাকে পাগল ভাববেন যে আমি একজন খ্রিষ্টান হয়েও এমন কথা বলছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে মুহাম্মদ, আল্লাহ্‌র রসুল (সা.), ছিলেন ঈসা নাসরীর চেয়েও মহান, এবং যে মহত্তর শিক্ষা তিনি পৃথিবীতে এনেছিলেন, তা ঈসা (আ.) আনতে পারেন নি।"

তিনি আরও বললেন, "আপনি হয়তো বিস্মিত হবেন যে আমি একজন খ্রিষ্টান হয়েও এমন কথা বলছি, কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করব কীভাবে?" পরে, যখন আমি আমার কক্ষে ফিরছিলাম, অনুভব করলাম কেউ আমার পেছন পেছন আসছে। ফিরে তাকিয়ে দেখি, ডেকমন্ড শ-ই। তিনি বললেন, " আমার মনে একটি প্রশ্ন এসেছে, আমি তা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। যখন আমি ঘোষণা করি যে মুহাম্মদ, আল্লাহ্‌র রসুল (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তখন আমার মনে হয় যেন আমার জিভ দিয়ে আল্লাহ নিজেই কথা বলছেন। তবুও এই খ্রিষ্টানরা তা মানতে চায় না।"

আমি বললাম, 'মিস্টার ডেসমন্ড শ, এরা কেবল আপনার কণ্ঠস্বর শোনে; আল্লাহ্‌র কণ্ঠস্বর শোনে না। কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্‌র কণ্ঠও শুনতে শুরু করবে- যখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে কথা বলবেন- তখন তারাও প্রভাবিত হবে, এবং মুহাম্মদ, আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)-এর মহিমা স্বীকার করবে।" এটি শুনে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের আয়াতে বলেন: "নিশ্চয় তুমি সরল পথে অবস্থান করছ।" (সূরা যুখরুফ: ৪৩) এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ নবী করীম (সা.)-এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন- যে পৃথিবী যতবারই তাঁকে অস্বীকার করুক না কেন, সময়ের নানা পরীক্ষার পর অবশেষে মানবজাতি ফিরে আসবে সেই শিক্ষার দিকে যা তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল; কারণ তিনি হিদায়াতের সরল পথে অবিচল, আর মানুষ বিভ্রান্তি ও অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। (তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir